Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাবাসসুম আক্তার তানজিলা

রোলঃ 227020101

২৯ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাবাসসুম আক্তার তানজিলা
রোলঃ 227020101

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তাবাসসুম আক্তার তানজিলা, আইডিঃ 227020101 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৯ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

তাবাসসুম আক্তার তানজিলা

আইডিঃ 227020101

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

রোজা ফরজ হওয়ার শর্তাবলী:..6

যার উপর রোজা আদায় করা ফরজ : 6

রোজার উদ্দেশ্য: 7

রামাদানের বিশেষত্ব: 8

রমাদানে আল্লহর ক্ষমা পাওয়ার সুযোগ সমুহ:...9

রমযান মাসে এক দিরহাম দানে হাজার দিরহামের সওয়াব:.. 13

রোযা হল জান্নাত লাভের পথ:.. 15

রোযাদারগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে ‘রাইয়ান’ নামক বিশেষ দরজা দিয়ে:........................ 16

রোযা কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে: 18

রোযা জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী ঢাল ও দুর্গ:.. 19

রোযাদারের মুখের গন্ধ মিশকের চেয়েও সুগন্ধিযুক্ত:.. 20

রমজান জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের মাস: 20

সিয়াম ইহকাল ও পরকালের সাফল্যের মাধ্যম:.. 21

সিয়াম আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ ও তার দাসত্ব প্রতিষ্ঠার প্রশিক্ষণ:.............................. 21

ঈমানকে দৃঢ় করা, মোরাকাবা ও আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করা:- 22

সাওমের মিষ্টতা 24

রমাদান আত্মশুদ্ধির বিপ্লব ঘটায়: 35

রমাদান কুরআনের সাথে উত্তম সম্পর্ক গড়ে তোলার মাস:... 37

যেভাবে কুরআনের সাথে সম্পর্ক বাড়ানো যায়: 38

রমাদানে সময় নষ্ট না করা:... 40

রমাদানে সময় নষ্ট না করার কারণ:.. 40

সময় নষ্ট হয় যেসব কারণে:.. 41

সময় নষ্ট না করার উপায়:..41
সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার:..42
সময় নষ্টের ক্ষতি : 43
রমাদানে জিহবার সংযম:..43
রমাদানে হারিয়ে যাওয়া ইবাদাতগুলো পুনরুজ্জীবিত করুন..54
ফজরের আগে ইস্তিগফার..55
তাফাক্কুর..58
তাবাত্তুল..63
রামাদান মাসে আমলে মনোযোগী হওয়ার উপায়..65
মনকে লক্ষের প্রতি নিবদ্ধ করা 67
রোজার শারিরিক উপকারিতা..77
রোজার মানসিক উপকারিতা..79
রামাদানের শেষ দশ দিন..82

রোজা ফারসি শব্দ। এর আরবি প্রতিশব্দ হলো "সাওম"। যার আভিধানিক অর্থ হলো কোনো কিছু থেকে বিরত থাকা। শরিয়তের পরিভাষায় রোজা হলো সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যাবতীয় পানাহার , স্ত্রী সহবাস, রোজা ভঙ্গকারী যেকোনো কাজ এবং শরীয়ত-নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকা।

রামাদান মাস হচ্ছে মুসলিম জাতির আমলী মাস।রমাদান মাস রবের অতি নিকটে যাওয়ার মাস।অন্য সব মাসের তুলনায় এই মাসের আমলের সওয়াব অনেক বেশি। তবে এই রমাদান মাসের স্থায়িত্ব হয় খুব অল্প সময়ের জন্য, এবং খুব অল্প কিছু সৌভাগ্যবান বান্দারাই কেবল এই মাসের শীতল বাতাসে রোমাঞ্চিত হওয়ার সুযোগ পায়। বর্তমানে রমাদান যেন গতানুগতিক আনুষ্ঠান পরিণত হয়েছে, সবকিছুর ভিড়ে চোখের পলকেই সেই রমাদান আবার চলে যায়। কিন্তু কয় জনই বা রমাদানের শীতল বাতাসে নিজেদের প্রশান্ত করতে পারে? নিজেদের পাপের বোঝা হালকা করে এক বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে জাহান্নামের আগুন থেকে অনন্ত সুখের জান্নাতে নিজেদের নামটা লিখিয়ে নিতে পারে কয়জন? রব্ব আমাদের সেই সৌভাগ্যবানদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তৌফিক দিক।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার। (সূরা বাকারা: ১৮৩)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنَـٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ

অর্থাৎ, রমযান মাস, মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের। পার্থক্যকারীরূপে কুরআন এতে অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে তারা যেন এ মাসে সিয়াম (রোযা) পালন করে। (সূরা বাকারা: ১৮৫)

রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেন,
ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি স্তম্ভের উপর, এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, বায়তুল্লাহর হজ করা এবং রমযান মাসে রোযা পালন করা।

(বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

রোজা ফরজ হওয়ার শর্তাবলী:

রোজা ফরজ হওয়ার শর্ত হলো-
১) প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া।
২)মুসলমান হওয়া।
৩)বিবেকবান হওয়া।
৪)দারুল ইসলামের অধিবাসী হওয়া। ৫)রমজান মাস আসা।

যার উপর রোজা আদায় করা ফরজ :

তিন শ্রেণীর ব্যক্তির উপর রোজা আদায় করা ফরজ। যথা:-
১) মুকিম ব্যক্তির উপর।
২) সুস্থ ব্যক্তির উপর।
৩) হায়েজ ও নিফাসমক্ত নারীর উপর।

রোজার উদ্দেশ্য:

রোজার প্রধান উদ্দেশ্য হলো আত্মশুদ্ধি অর্জন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা। এটি একজন মুসলিমকে শারীরিক, মানসিক এবং আত্মিক দিক থেকে উন্নত করে। নিচে রোজার মূল উদ্দেশ্যগুলো আলোচনা করা হলো:

১. তাকওয়া অর্জন: রোজার মাধ্যমে একজন মুসলমান আল্লাহর প্রতি ভক্তি ও ভয় অর্জন করে। এটি তাকে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে এবং সংযমী হতে সাহায্য করে।

২. আত্মশুদ্ধি ও সংযম অনুশীলন: রোজা মানুষের নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ক্ষুধা, পিপাসা এবং শারীরিক চাহিদা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে সে সংযমের গুণ অর্জন করে।

৩. সহানুভূতি ও সহমর্মিতা বৃদ্ধি: রোজা রাখার মাধ্যমে একজন মুসলিম ক্ষুধার কষ্ট অনুভব করে এবং সমাজের দরিদ্র মানুষদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশে উদ্বুদ্ধ হয়। এটি ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সহমর্মিতার সেতু তৈরি করে।

৪. আল্লাহর আদেশ পালন: রোজা রাখা আল্লাহর নির্দেশ। কুরআনে বলা হয়েছে, "হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেরূপ তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হয়েছিল। যাতে তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পারো।" (সুরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৩)

৫. আত্মনিয়ন্ত্রণ ও ধৈর্য বৃদ্ধি: রোজা মানুষকে ধৈর্যশীল হতে শেখায় এবং নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি প্রদান করে। এটি আত্মাকে খারাপ চিন্তা ও কাজ থেকে বিরত রাখে এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের সুযোগ করে দেয়।

রোজা শুধু একটি ইবাদত নয়; এটি মানুষের চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ।

রামাদানের বিশেষত্ব:

রমাদানের বিশেষত্ব হচ্ছে এই মাসে আমল করলে অনেক বেশি সওয়াব পাওয়া যায়। বছরের বাকি মাস গুলোতে যেসব ইবাদত আমরা হেলায় হারিয়ে ফেলি, তার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার উপযুক্ত সময় রমাদান। এ রমাদানে আমরা যতটুকু জিকির করব যতটুকু সালাত আদায় করব যতটুকু তিলাওয়াত করব, তার সব অন্য যেকোনো মাসের তুলনায় অনেক বেশি হবে। প্রকৃতপক্ষে এ মাসে সোয়াদ এত বেশি যে আমরা হিসাব করে শেষ করতে পারবো না।

এই মাসের সওয়াব এত বেশি যে শুধু আল্লাহই এর হিসাব করতে পারেন।আর এই মাসের সওয়াব এর পরিমাণ বাড়তেই থাকে যতক্ষণ না তার সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে যায় অর্থাৎ "১ হাজার মাস"। লাইলাতুল ক্বদর এর এক রাকাত সালাতের সাওয়াব হবে ৩০ হাজার রাত ধরে সালাত পড়ার সমান। সুবহান আল্লহ।

জান্নাতুল ফেরদৌসের শিখরে পৌঁছানোর পথটি হলো আল্লাহর ইবাদত পূর্ণ পথ। রামাদান একটি বরকতপূর্ণ মাস এবং পরশ্রম করার উপযুক্ত মৌসুম।

রমাদানে শয়তান কে বন্দি করে রাখা হয়, যে শয়তান আমাদের গুনাহ করার একটি কারণ। গুনাহ আরো একটি কারণ রয়েছে সেটি হচ্ছে স্বয়ং নিজের নফস।

যদি কেউ রমাদানেও পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ে তাহলে বুঝতে হব, তার নাফসুল আম্মারাহ স্বয়ং শয়তানের চেয়েও খারাপ।
আল্লহ তা'য়ালা বলেন,

۞ وَمَآ أُبَرِّئُ نَفۡسِيٓۚ إِنَّ ٱلنَّفۡسَ لَأَمَّارَةُۢ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيٓۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٥٣

“নিশ্চয়ই নাফ মস মন্দ কাজের নির্দেশ দিয়ে থাকে” [সূরা ইউসুফ ১২:৫৩]

রামাদান হলো ঈমানের জন্য শিফা বা ঔষধ। কারণ সাথে আমাদের ঈমানে দুর্বলতা আসে। এবার কাপড় ধোয়া হয় বারবার ধোয়ার ফলে কাপড় পুরনো হয়ে যেতে থাকে। যেমন: লোহা বাতাসে ফেলে রাখলে অক্সিডেশনের মাধ্যমে তার গায়ে মরিচা পড়ে যায়. তারবানি গ্রন্থে আব্দুল্লা ইবনে উমর রা: থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সা: বলেছেন,

কাপড় যেভাবে পুরনো হয়ে যায় তেমনি তোমাদের অন্তরে ঈমানও পুরনো হয়ে যায়। তাই আল্লাহর কাছে দোয়া করো যেন তিনি তোমাদের অন্তরসমূহে ঈমানকে পুনরায় তাজা করে দেন। [মুসনাদে আহমাদ:৫]

রমাদান ই উপযুক্ত সময়, আল্লহর সাথে সম্পর্ক টা মজবুতে করে নেওয়ার। তাই আল্লহর কাছে বেশি বেশি দুআ করতে হবে। রমাদান অন্তরের ময়লা ঝেড়ে দেয়।

রমাদানে আল্লহর ক্ষমা পাওয়ার সুযোগ সমুহ:

প্রথম সুযোগ :

সাথে এবং আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কারে আশায় রামাদানের সিয়াম পালন করবে তার গুনা সমূহ মাফ করে দেওয়া হবে । [সহিহ বুখারী-৩৮]

এই হাদিসে 'ঈমান' ও 'ইহতিসাব' শব্দ দু'টি উল্লেখ করা হয়েছে। এর ব্যাখ্যায় ইবনু হাজার (রহ.) বলেন, ঈমান অর্থ বিশ্বাস আর এই ঈমান আনা সবার উপর ফরজ । আর 'ইহতিসাব' মানে শুধুমাত্র আল্লাহর কাছ থেকেই পুরস্কারের আশা করা।।

আর এই পুরস্কার হচ্ছে- আল্লাহর ক্ষমা। শুধু ক্ষম্য ই কি শেষ পুরস্কার? না, এটাই শেষ পুরস্কার নয়। বরং এর বাইরেও প্রতিদিন কিছু বিশেষ মুহূর্ত আপনি পাবেন, যখন

আপনার দুআগুলো কবুল করা হয়। প্রতিদিন আপনি পাহাড় সমান আমল করতে পারেন। সেটা এত বিশাল যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো পক্ষে এগুলোর হিসাব রাখা সম্ভব নয়। প্রতিদিন সিয়াম পালনের মাধ্যমে আপনি জাহান্নাম থেকে কমপক্ষে সত্তর বছরের দূরত্বে চলে যেতে পারেন। যদি আপনি পুরো রামাদান সিয়াম পালন করেন তাহলে সত্তর গুণ ত্রিশ-অর্থাৎ জাহান্নাম থেকে আপনি দুই হাজার একশ বছরের দূরত্বে চলে গেলেন।

অর্থাৎ প্রথম হাদিস অনুযায়ী যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় ঈমান ও ইহতিসাব সহকারে সিয়াম পালন করে-তাদের ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় সুযোগ:

কোনো কারণে হয়তো আপনার সাওমে কিছু ত্রুটি বা কমতি থেকে গেল। এতে হতাশ হওয়ার কিছু নেই, কারণ আরেকটা সুযোগ আছে আল্লাহর ক্ষমা লাভের। তা হলো রাততে সালাত পড়া।

"যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কারের আশায় রামাদানে কিয়াম করবে, তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে।" [সহিহ বুখারি-৩৭]

তৃতীয় সুযোগ:

কারো সাওম এবং কিয়াম দুটোতেই ত্রুটি ছিল। তার জন্য তৃতীয় আরেকটি সুযোগ আছে। আর সেই সুযোগটি হলো লাইলাতুল কদর-যে একটি রাতই আল্লাহর মাগফিরাত অর্জন করার জন্য যথেষ্ট।

"যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কারের আশায় লাইলাতুল কদরের সালাত আদায় করবে তার গুনাহের সময় মাফ করে দেওয়া হবে। [সহিহ বুখারি-২০১৪]

চতুর্থ সুযোগ :

ইফতারের সময় দোয়া কবুল হওয়া

রমাদানের দিনগুলোতে ইফতারের সময় একটি বিশেষ মুহূর্ত থাকে, যখন রোজাদারের দোয়া আল্লাহ তাআলা কবুল করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"রোজাদারের জন্য ইফতার করার সময় একটি দোয়া কবুল হয়।" (তিরমিজি)

এ সময় যদি কেউ আল্লাহর কাছে তার গুনাহ মাফ চেয়ে sincere দোয়া করে, তাহলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন।

পঞ্চম সুযোগ :

সাহরির সময় দোয়া ও আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা

রমাদান মাসে সাহরির সময় আল্লাহর রহমত এবং ক্ষমা লাভের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"আল্লাহ তাআলা রমাদান মাসের সেহরি সময়ে তাঁর বান্দাদের ওপর দয়া করেন এবং ক্ষমা প্রদান করেন।" (সুনান ইবনে মাজাহ)

এ সময় আল্লাহর কাছে দোয়া করলে তার দয়া ও ক্ষমা লাভের বিশেষ সুযোগ থাকে।

ষষ্ঠ সুযোগ:

তাওবা ও ইস্তিগফার

রমাদান মাস হলো তাওবা (পাপ থেকে ফিরে আসা) এবং ইস্তিগফার (আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া) করার সময়। রমাদান মাসে আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের পাপ মাফ করার জন্য আরও বেশি প্রস্তুত থাকেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল।" (সুরা নূর, আয়াত: ৩১)

রমাদান মাসে অধিক পরিমাণে তাওবা ও ইস্তিগফার করার মাধ্যমে বান্দা তার সকল গুনাহ মাফ করানোর সুযোগ পায়।

সপ্তম সুযোগ:
গরীব ও মিসকিনকে সাহায্য করা
রমাদান মাসে গরীব-দুঃখীদের প্রতি সহানুভূতির মাধ্যমে আল্লাহর রহমত লাভ করা যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"যে ব্যক্তি রমাদান মাসে একটি রোজাদারের ইফতার দেয়, তার জন্য আল্লাহ তাআলা পুরস্কার দেন, এবং তার গুনাহ মাফ করে দেন।" (তিরমিজি)

খেয়াল করলে দেখবেন সবগুলো হাদিসের শেষে একই কথা বলা হয়েছে-আপনার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। আপনাকে মাফ করে দেওয়া হবে যদি আপনি রামাদানে সিয়াম পালন করেন, রাতে সালাত আদায় করেন এবং লাইলাতুল কদরের রাতে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদাত করেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনাকে শুধু ক্ষমা-ই উপহার দেওয়া হচ্ছে তা কিন্তু নয়, বরং আপনার প্রতিটি আমলের জন্য আল্লাহ কয়েক গুণ সাওয়াব দিয়ে জান্নাতে আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। কিন্তু আপনি যদি আল্লাহর ক্ষমা না পান-তবে সেটা আপনার গাফিলতি আর ফাঁকিবাজির ফল। কিন্তু এর মাধ্যমে আপনি কাকে ফাঁকি দিচ্ছেন? আল-গাফুর আল্লাহর ক্ষমাকে? আপনি চারদিক থেকে আপনার দিকে ছুটে আসা রহমত ও ক্ষমাকে এড়িয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু মনে রাখবেন, দুনিয়ার শান্তি আর অনন্ত সুখের জান্নাতে প্রবেশের জন্য এই রহমত আর ক্ষমা আপনার একান্ত প্রয়োজন। একদিন যার জন্য আপনি আফসোস করবেন।

ক্ষমা আর উচ্চ মর্যাদা লাভের এত বেশি সুযোগ রামাদানে আছে যে, যে ব্যক্তি এই সুযোগ হেলায় হারায় তাকে নবিজি(স.)এবং রুহুল কুদুস জিবরীল (আ.)-উভয়ই বদ-দুআ করেছেন।

রমযান মাসে এক দিরহাম দানে হাজার দিরহামের সওয়াব:

সহিহ আল বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত আছে ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, নবিজি (সা.) ছিলেন সবচেয়ে দানশীল ব্যক্তি। রামাদান মাসেও তিনি ছিলেন সবচেয়ে দানশীল মানুষ, যে মাসে জিবরীল(আ.)। তাঁর সাথে কুরআন পড়তে আসতেন আর একে অন্যের সাথে মিলিয়ে নিতেন। ইবনু আব্বাসের ভাষায়, আল্লাহর রাসূল(সা.) ছিলেন বহমান বাতাসের চাইতেও উদার।

ইমাম শাফি'ঈ (রহ.) বলেছেন, "আমি চাই মানুষ যেন রামাদানে উদারহস্তে দান খয়রাত করে, এটাই নবিজি (সা.)-এর দেখানো পথ।" দেখা যায় রামাদানে অনেকেই সালাত আর ইবাদাত নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে আর সাদাকার বিষয়টি পাত্তা দেয় না। সালাফরা বলতেন, রাদামান মানেই হলো কুরআন ও দান সাদাকার মাস, আর কিছু না। অর্থাৎ রামাদান মাসে অন্য কিছুর সাওয়াব এগুলোর সমান নয়।

আল্লাহর চোখে দানের পরিমাণ মুখ্য না, বরং দান করছেন কি না সেটাই আসল বিষয়। অনেকে কম পরিমাণ সাদাকা করতে পারে, সেটা সমস্যা না। কারণ, আল্লাহর চোখে এক টাকা দশ লক্ষ টাকার সমান হতে পারে।

সুনানে নাসাঈতে বলা আছে, "এক দিরহাম দানে হাজার দিরহামের সাওয়াব। "

এক টাকা আপনাকে লক্ষ টাকার চেয়ে দামি সাওয়াব এনে দিতে পারে। কখন? যদি আপনার শুধু দুই টাকা থাকে আর সেখান থেকে এক টাকা দান করেন, তাহলে আপনি আপনার অর্ধেক সম্পদ দান করে দিলেন।

আর যে লোকটা লাখপতি, সে যদি আপনার সমান সাওয়াব পেতে চায়, তাহলে তাকে লক্ষ টাকা দান করতে হবে, কারণ তার সম্পত্তির অর্ধেক করলেও কয়েক লাখ টাকা হয়।

দান করার সময় আপনাকে নম্র হতে হবে। আপনার এটা ভেবে সম্মানিত বোধ করা উচিত যে, আপনাকে দান করার তাওফিক দেওয়া হয়েছে। আপনার মুগ্ধ হওয়া উচিত এই ভেবে যে, আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন এবং আপনি আল্লাহর জন্যই দিচ্ছেন। আর আপনার আনন্দিত হওয়া উচিত এই কারণে যে, কেউ একজন তা গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ সাদাকার মাধ্যমে আপনি আসলে নিজেই নিজের উপকার করছেন।

"আর তোমরা যে সম্পদ ব্যয় কর, তা তোমাদের নিজেদের জন্যই।" (সূরাহ বাক্বারা ২:২৭২)

আমরা যদি গরীব সেই ভিক্ষুককে দান না করেন, আল্লাহ ঠিকই তার জন্য কোনো না কোনো একটা ব্যবস্থা করেই দেবেন। এই ভেবে সম্মানিত বোধ করুন যে, আল্লাহ আপনাকে সম্মানিত করেছেন তাকে দান করার সুযোগ দিয়ে। তাই বেশি বেশি দান করুন, যাকে দান করছেন তাকে ধন্যবাদ জানান এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করুন। কারণ এর মাধ্যমে আপনি অন্য কারো না, বরং নিজের উপকার করছেন।

কোনো ভালো আমলকে ছোট করে দেখবেন না। ইবনু উমর (রা.) সাদাকা করার জন্য তাঁর সাথে চিনি রাখতেন। সে যুগের চিনিকে তুলনা করা যেতে পারে আজকের যুগের ক্যান্ডির সাথে। মানুষ তাঁকে জিজ্ঞেস করত, "আপনি চিনি কেন সাদাকা হিসেবে দান করছেন?" তিনি বলতেন, "কারণ আমি চিনি পছন্দ করি আর আল্লাহ বলেছেন,

"তোমরা কখনো কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না ব্যয় করবে তা থেকে, যা তোমরা ভালবাসো। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।" (সূরাহ আলে ইমরান ৩:৯২)

একবার উমর (রা.) একটা আঙ্গুর দান করলেন। মানুষজন বলতে লাগল, "মাত্র একটা আঙ্গুর! এটা না তৃষ্ণা মেটায়, না পেট ভরায়।" উমর (রা.) তখন কুরআনের একটি আয়াত পাঠ করলেন,

"অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা সে দেখতে পাবে।" (সূরাহ যিলযাল ৯৯:৭)

দান সাদাকার মাধ্যমে হতে পারে আল্লাহ আমাদেরকে আসন্ন কোন রোগ- বালাই থেকে বাচিয়ে দিবেন - হয়তো সাধারণ ঠান্ডা লাগা। তো আপনার ঠান্ডা লেগেছে ঔষধ কিনতে হয়েছে, কাছ থেকে ছুটি নিতে হয়েছে, ডাক্তার দেখাতে হয়েছে, যন্ত্রণার কথা বাদই দিলাম।কিন্তু আপনি আন্তরিক নিয়তে ১০০ টাকা সাদাকাহ করলেন তার বিনিময় আল্লাহ আপনাকে এসব রোগ বালাই থেকে রক্ষা করলেন।

সাদাকার সৌন্দর্য হচ্ছে গোপনীয়তা রক্ষা, রব্ব আমাদের সম্পূর্ণ রিয়া মুক্ত থেকে তার রাস্তায় ব্যয় করার তৌফিক। আমিন।

রোযা হল জান্নাত লাভের পথ:

কিয়ামতের দিন রোজাদাররা তাদের রোজার পুরস্কার হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তাআলা তার মেহেরবানির মাধ্যমে রোজাদারদের জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দিবেন।

হযরত হুযায়ফা রা. বলেন, আমি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার বুকের সাথে মিলিয়ে নিলাম, তারপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি লাইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় একদিন রোযা রাখবে, পরে তার মৃত্যু হয় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোনো দান-সদকা করে তারপর তার মৃত্যু হয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। [মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২৩৩২৪; মুসনাদে বাযযার, হা.২৮৫৪]

হযরত আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আগমন করে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন, যার দ্বারা আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। তিনি বলেন, তুমি

রোযা রাখ, কেননা এর সমতুল্য কিছু নেই। আমি পুনরায় তার নিকট এসে একই কথা বললাম। তিনি বললেন, তুমি রোযা রাখ। [মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২১৪৯; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ১৮৯৩; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৩৪২৬; সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ২৫৩০]

রোযাদারগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে 'রাইয়ান' নামক বিশেষ দরজা দিয়ে:

রোজাদারদের জন্য জান্নাতে প্রবেশের একটি বিশেষ দরজা রয়েছে, যার নাম "রাইয়ান"। এটি একটি বিশেষ সুযোগ, যা শুধুমাত্র রোজা রাখা ব্যক্তিরাই উপভোগ করবে। হাদিসে এর সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত সাহল ইবনে সা'দ রা. হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছে,

জান্নাতে একটি দরজা আছে, যার নাম রাইয়ান। কিয়ামতের দিন এ দরজা দিয়ে কেবল রোযাদার ব্যক্তিরাই প্রবেশ করবে। অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা করা হবে- কোথায় সেই সৌভাগ্যবান রোযাদারগণ? তখন তারা উঠে দাড়াবে। তারা ব্যতীত কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। অতঃপর রোযাদারগণ যখন প্রবেশ করবে, তখন তা বন্ধ করে দেওয়া হবে। ফলে কেউ ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না।

[সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৮৯৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১১৫২; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২৮১৮]

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

প্রত্যেক প্রকারের নেক আমলকারীর জন্য জান্নাতে একটি করে বিশেষ দরজা থাকবে, যার যে আমলের প্রতি অধিক অনুরাগ ছিল তাকে সে দরজা দিয়ে আহবান করা হবে। রোযাদারদের জন্যও একটি বিশেষ দরজা থাকবে, যা দিয়ে তাদেরকে ডাকা হবে, তার নাম হবে 'রাইয়ান'।

আবু বকর রা. বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এমন কেউ কি হবেন, যাকে সকল দরজা থেকে আহবান করা হবে? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমি আশা রাখি তুমিও তাদের একজন হবে।

[মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৯৮০০; মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদীস : ৩২৬২৮]

অতএব, রোজা পালনের মাধ্যমে একজন মুসলিম জান্নাতের পথে এগিয়ে যেতে পারে, কারণ এটি আত্মশুদ্ধি, আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ, এবং জান্নাতে প্রবেশের এক অন্যতম পথ।

আল্লাহ তাআলা রোযাদারকে কেয়ামতের দিন পানি পান করাবেন:

হযরত আবু মুসা রা. হতে বর্ণিত,

আল্লাহ রাববুল আলামীন নিজের উপর অবধারিত করে নিয়েছেন, যে ব্যক্তি তার সন্তুষ্টির জণ্য গ্রীষ্মকালে (রোযার কারণে) পিপাসার্ত থেকেছে, তিনি তাকে তৃষ্ণার দিন (কিয়ামতের দিন) পানি পান করাবেন ।

[মুসনাদে বাযযার, হাদীস : ১০৩৯; মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস : ৫০৯৫]

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

আল্লাহ তাআলা বলেন, রোযা আমার জন্য, আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব। কেয়ামতের দিন রোযাদারদের জন্য একটি বিশেষ পানির হাউজ থাকবে, যেখানে রোযাদার ব্যতীত অন্য কারো আগমন ঘটবে না।-মুসনাদে বাযযার, হাদীস : ৮১১৫; মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস : ৫০৯৩

রোযা কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে:

রোজা কিয়ামতের দিন রোজাদারের জন্য সুপারিশ (শাফা'আত)করবে, যা একটি মহান পুরস্কার হিসেবে তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা প্রদানের মাধ্যমে তাদের গুনাহ মাফ করার এবং জান্নাতে প্রবেশের পথ সুগম করার উপায়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন.

রোযা ও কুরআন কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, হে রব! আমি তাকে খাদ্য ও যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত রেখেছি। অতএব তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন।

কুরআন বলবে, আমি তাকে রাতের ঘুম থেকে বিরত রেখেছি, (অর্থাৎ না ঘুমিয়ে সে তেলাওয়াত করেছে) অতএব তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর তাদের উভয়ের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৬৬২৬; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস : ২০৮০; বাইহাকী শুয়াবুল ঈমান, হাদীস : ১৯৯৪

রোজার সুপারিশের সুবিধা:

গুনাহ মাফ: রোজা তার সুপারিশের মাধ্যমে রোজাদারের গুনাহ মাফ করতে সাহায্য করবে।

জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ: সুপারিশের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা রোজাদারকে তার কৃপা দ্বারা জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ করে দিয়েছেন।

রোযা জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী ঢাল ও দুর্গ:

হযরত জাবির রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

আমাদের মহান রব ইরশাদ করেছেন- রোযা হল ঢাল। বান্দা এর দ্বারা নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে। রোযা আমার জন্য আর আমিই এর পুরস্কার দিব।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৪৬৬৯; শুয়াবুল ঈমান বাইহাকী, হাদীস : ৩৫৭০

উসমান ইবনে আবিল আস রা. বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

রোযা হল জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী ঢাল, যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাদের (শত্রুর আঘাত হতে রক্ষাকারী) ঢালের মত।
[মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৬২৭৮; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ২১২৫; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৩৬৪৯; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৬৩৯]

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

الصيام جنة، وحصن حصين من النار

রোযা হল (জাহান্নাম থেকে পরিত্রান লাভের) ঢাল এবং সুরক্ষিত দুর্গ।[মুসনাদে আহমদ, হাদীস-৯২২৫; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান, হাদীস-৩৫৭১]

রোযাদারের মুখের গন্ধ মিশকের চেয়েও সুগন্ধিযুক্ত:

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

والذى نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك،

সেই সত্তার শপথ, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন, রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকের সুগন্ধির চেয়েও অধিক সুগন্ধিময়।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৯০৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১১৫১ (১৬৩); মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৭১৭৪; সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ২৫২৩; সুনানে ইবনে মাজাহ- ১৬৩৮

এই হাদিসের মাধ্যমে বুঝানো হচ্ছে যে, রোজা রাখা একটি মহান ইবাদত। রোজা রাখার সময় মানুষের মুখে যেহেতু খাবার ও পানীয় থেকে বিরত থাকতে হয়, ফলে মুখে কিছুটা গন্ধ হতে পারে, তবে এই গন্ধটি আল্লাহ তাআলার কাছে এত মূল্যবান যে, তিনি এটিকে মিশকের চেয়েও বেশি সুগন্ধি মনে করেন।

রমজান জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের মাস:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন

إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن، وغلقت أبواب النار، فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد كل ليلة :يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر !والله عتقاء من النار،

وذلك في كل ليلة .السنن الصغرى :١٤٢٩

রমজান মাসের প্রথম রজনীর যখন আগমন ঘটে তখন শয়তান ও অসৎ জিনগুলোকে বন্দি করা হয়। জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়, এ মাসে একটি দরজাও খোলা হয় না। জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, এ মাসে তা আর বন্ধ করা হয়

না। প্রত্যেক রাতে একজন ঘোষণাকারী এ বলে ঘোষণা দিতে থাকে যে, হে সৎকর্মের অনুসন্ধানকারী তুমি অগ্রসর হও! হে অসৎ কাজের অনুসন্ধানকারী তুমি থেমে যাও! এ মাসের প্রতি রাতে আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম থেকে বহু মানুষকে মুক্তি দিয়ে থাকেন।"

সিয়াম ইহকাল ও পরকালের সাফল্যের মাধ্যম:

হাদীসে এসেছে-

«للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. مسلم: ١٥١ البخاري: ١٧٩٠

'সিয়াম পালনকারীর জন্য দুটি আনন্দ: একটি হল ইফতারের সময় অন্যটি তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের সময়।

ইফতারের সময় আনন্দ হল এ কারণে যে, সিয়াম পূর্ণ করতে পারল ও খাবার-দাবারের অনুমতি পাওয়া গেল। এটা বাস্তব সম্মত আনন্দের বিষয়, যা আমাদের সকলের বুঝে আসে ও অনুভব করি। অপর দিকে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের যে আনন্দ, তা অনুভব করতে আমরা এখন না পারলেও কেয়ামতের দিন পারা যাবে। যখন সকল মানুষ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহমুখী থাকবে।

সিয়াম আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ ও তার দাসত্ব প্রতিষ্ঠার প্রশিক্ষণ:

মানুষ যখন তার প্রবৃত্তির গোলামি ও শয়তানের আগ্রাসন থেকে মুক্তি লাভ করবে তখনই সে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বান্দা বা দাস হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ব্যতীত তার সামনে আর কোন উদ্দেশ্য থাকে না। তাই সে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সিয়াম আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ ও তার দাসত্ব প্রতিষ্ঠার প্রশিক্ষণ:

মানুষ যখন তার প্রবৃত্তির গোলামি ও শয়তানের আগ্রাসন থেকে মুক্তি লাভ করবে তখনই সে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বান্দা বা দাস হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ব্যতীত তার সামনে আর কোন উদ্দেশ্য থাকে না। তাই সে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আদেশ-নিষেধকে নিজের প্রবৃত্তির দাবির উপর অগ্রাধিকার দেয়। এতে যত কষ্ট হোক, যত ধৈর্যের প্রয়োজন হোক, যত ত্যাগের দরকার হোক সব কিছু করতে সে প্রস্তুত হয়ে যায়। তাই সিয়াম পালনকারীকে দেখবেন সে দিনের বেলা খাচ্ছে না, খাচ্ছে রাতে। রাতে নিদ্রা যাচ্ছে না, রাত জেগে সে সালাত আদায় করছে। মিথ্যা কথা ও কাজ এবং সব ধরনের অসদাচরণ সে পরিহার করে চলছে। অথচ তার মন ও প্রবৃত্তি নির্দেশ দিচ্ছে দিনের বেলায় খাওয়া-দাওয়া করতে, রাতের বেলা বিশ্রাম নিতে, মিথ্যা কথা বলতে ইত্যাদি। এমনিভাবে সিয়াম ও এ সম্পর্কিত কাজগুলো আদায় করার মাধ্যমে সিয়াম পালনকারী প্রবৃত্তিসহ সকল মানুষের দাসত্ব অস্বীকার করে আল্লাহর দাসত্বে প্রবেশ করার যোগ্যতা অর্জন করে।

ঈমানকে দৃঢ় করা, মোরাকাবা ও আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করা:-

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্ধারণ করা সময়ে তারই সন্তুষ্টি লাভের জন্য সকল প্রকার পানাহার পরিহার করা, আল্লাহকে ভয় করা ও তার মোরাকাবার একটি বলিষ্ঠ প্রমাণ বহন করে। এটাই প্রকৃত ঈমান। সিয়াম পালনকারী যদি লোক চক্ষুর আড়ালে পানাহার করে আর মানুষের কাছে প্রকাশ করল যে, সে সিয়াম অবস্থায় আছে, তাহলে সে সিয়াম পালনকারী বলে গণ্য হবে না। এমনিভাবে সে দিনের বেলা পানাহার ও যৌনাচার ত্যাগ করল বটে কিন্তু সিয়ামের নিয়ত ধারণ করেনি, তাহলে সে সিয়াম আদায় করেছে বলে ধরা হবে না। সিয়াম পালনকারীর এ অনুভূতি আল্লাহকে ভয় করা ও তার মোরাকাবার প্রমাণ দিতে শিখায়। মোরাকাবা আদেশ-নিষেধকে নিজের প্রবৃত্তির দাবির উপর অগ্রাধিকার দেয়। এতে যত কষ্ট হোক, যত ধৈর্যের প্রয়োজন হোক, যত ত্যাগের দরকার হোক সব কিছু করতে সে প্রস্তুত হয়ে যায়। তাই সিয়াম পালনকারীকে দেখবেন সে দিনের বেলা খাচ্ছে না, খাচ্ছে রাতে। রাতে নিদ্রা যাচ্ছে না, রাত জেগে সে সালাত

আদায় করছে। মিথ্যা কথা ও কাজ এবং সব ধরনের অসদাচরণ সে পরিহার করে চলছে। অথচ তার মন ও প্রবৃত্তি নির্দেশ দিচ্ছে দিনের বেলায় খাওয়া-দাওয়া করতে, রাতের বেলা বিশ্রাম নিতে, মিথ্যা কথা বলতে ইত্যাদি। এমনিভাবে সিয়াম ও এ সম্পর্কিত কাজগুলো আদায় করার মাধ্যমে সিয়াম পালনকারী প্রবৃত্তিসহ সকল মানুষের দাসত্ব অস্বীকার করে আল্লাহর দাসত্বে প্রবেশ করার যোগ্যতা অর্জন করে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্ধারণ করা সময়ে তারই সন্তুষ্টি লাভের জন্য সকল প্রকার পানাহার পরিহার করা, আল্লাহকে ভয় করা ও তার মোরাকাবার একটি বলিষ্ঠ প্রমাণ বহন করে। এটাই প্রকৃত ঈমান। সিয়াম পালনকারী যদি লোক চক্ষুর আড়ালে পানাহার করে আর মানুষের কাছে প্রকাশ করল যে, সে সিয়াম অবস্থায় আছে, তাহলে সে সিয়াম পালনকারী বলে গণ্য হবে না। এমনিভাবে সে দিনের বেলা পানাহার ও যৌনাচার ত্যাগ করল বটে কিন্তু সিয়ামের নিয়ত ধারণ করেনি, তাহলে সে সিয়াম আদায় করেছে বলে ধরা হবে না। সিয়াম পালনকারীর এ অনুভূতি আল্লাহকে ভয় করা ও তার মোরাকাবার প্রমাণ দিতে শিখায়। মোরাকাবা হলো: আল্লাহ আমাকে ও আমি যা করছি তা সর্বদা প্রত্যক্ষ করছেন। এ ধরনের দৃঢ় অনুভূতি ধারণ করা। তাই সিয়াম মুসলিমকে ঈমানের সত্যতার প্রমাণ দিতে প্রশিক্ষণ দেয়। তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, মুমিন হিসেবে তার কর্তব্য হল সর্বদা আল্লাহর মোরাকাবা করা অর্থাৎ এ দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা যে, আমার প্রতিটি মুহূর্তের প্রতিটি কাজ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পর্যবেক্ষণ করছেন। তাই আমাকে কোন কাজে তার অবাধ্য হওয়া চলবে না। তিনি যাতে সন্তুষ্ট হন, শুধু তা-ই আমাকে করতে হবে। যদি এ রকম মোরাকাবার সাথে সিয়াম আদায় করা যায়, তাহলে তার জন্য রয়েছে তা-ই যা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বলেছেন:-

:كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف، قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي

مسلم :١١٥١ ...

'মানব সন্তানের প্রতিটি নেক আমলের প্রতিদান দশ থেকে সাত শত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, কিন্তু সিয়ামের বিষয়টা ভিন্ন। কেননা সিয়াম শুধু আমার জন্য, আমিই তার প্রতিদান দেব। আমার জন্যই সে পানাহার ত্যাগ করে থাকে।

আর এ বিষয়টা সকল প্রকার ইবাদত-বন্দেগীতে থাকতে হয়। যখন মানুষ বিশ্বাস করবে আল্লাহ আমাকে সর্বদা দেখছেন তখন সে বিনা ওজুতে সালাত আদায় করবে না। ঠিক তেমনি কোন কাজে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করবে না। সকল প্রকার কাজ-কর্ম যথাযথ ও সুন্দরভাবে সম্পাদন করবে।

সাওমের মিষ্টতা

রামাদান অর্ধেকটা যেতে না যেতেই কেউ কেউ সাওম পালনের আনন্দ এবং উপর সামাই হারিয়ে ফেলে। আবার অনেকের মাগো রাই প্রবল আনন্দ আর উৎসংসার শুর স্যাকেই থাকে না। আল্লাহর অল্প সংখ্যক বান্দারাই প্রবল আনন্দ আর উৎসাহে রামাদান শুরু করে শেষ পর্যন্ত এই মহান ইবাদাতে তাঁদের পূর্ণ মনোযোগ ধরে রাখাতে সক্ষম হয়। আল্লাহ আমাদের এই অল্প সংখ্যকদের মাঝে শামিল করুন।

সাওম বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। এর মধ্যে আমরা সেই সাওম ই বাখতে যাইও সাওমের সাথে মনের আনন্দ জড়িত, যেনতেনভাবে সাওম পালনে আমরা অতষ্ঠা নই। সাওম পালনের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাই, গোজে শীতলতা অর্জন করতে চাই, পাশাপাশি আমরা সাওম পালন করছি এটা ভেবে তৃপ্তি পেতে চাই। আল্লাহ কুরআনে বলেন,

"হে বিশ্বাসীরা! সাওম তোমাদের ওপর ফরয করা হলো যেমন করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।" (সূরাহ বাকারা ২:১৮৩)

"হে বিশ্বাসীরা! সাওম তোমাদের ওপর ফরয করা হলো।"-কিন্তু কেন ফরয করা হলো? তাকওয়া অর্জনের জন্য।

আয়াতটির কোথাও কিন্তু সাওম পালনের মাঝে মনের আনন্দ এবং চোখের শীতলতা খোঁজার ব্যাপারে সরাসরি কোনো নির্দেশনা দেখতে পাওয়া যায় না। কারণ আল্লাহর অল্প কিছু সৌভাগ্যবান বান্দা ব্যতীত বেশিরভাগই সালাত কিংবা সাওমের এই গুপ্ত আনন্দ অনুভূতির সন্ধান পায় না। আমরা সেই অল্প কিছু বান্দার অন্তর্ভুক্ত হতে চাই।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সালাতের ব্যাপাবে বলতে গিয়ে সালাতের উদ্দেশোর ব্যাপারেও বলেছেন। তিনি বলেন,

اُتْلُ مَآ اُوْحِیَ اِلَیْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ وَلَذِكْرُ اللهِ اَكْبَرُ ؕ وَاللهُ یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ٤٥

"নিশ্চয়ই সালাত বিরত রাখে সকল
মন্দ কাজ থেকে।
(সূরাহ আল-আনকাবুত ২৯:৪৫)

সালাত ফাহশা তথা কাবীরা গুনাহ এবং মুনকার তথ্য কুফর ও শির্ক থেকে দূরে রাখে। রাসূল (সা.) বলেছেন, সালাত তাঁর চোখের শীতলতা এবং অন্তরের প্রশান্তি। [মুসনাদে আহমাদ-১২২৯৩]

আল্লাহ কুরআনে তাকওয়া অর্জনকে সাওমের এবং গুনাহ ও কুফর থেকে দূরে থাকাকে সালাতের উদ্দেশ্য বলেছেন। আর তাই আমরা যদি তাকওয়া অর্জন এবং ফাহশা কাজ থেকে বিরত থাকতে চাই, তবে সেটা সাওম পালন এবং সালাত আসায়ের মাধ্যমেই সম্ভব। এগুলো অর্জনের বাইরেও অন্য স্তর আছে, যা আসলে আল্লাহর বিশেষ বান্দাদের জন্য। আবার এই উপরের স্তরের মধ্যেও অন্য কিছু অভ্যন্তরীণ স্তর আছে, এই সকল স্তরের সংখ্যা অনেক এবং এসকল স্তরে উন্নীত হাতে হলে বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে ইবাদাত করে যেতে হবে। আর এই স্তরগুলো যারা আল্লাহর বিশেষ বান্দা হতে পারবে, তাদের জন্যই বরাদ্দ।

এটা অনেকটা আমাদের ঈমানের মতো। সার্বিকভাবে দেখতে গেলে আপনার ঈমানেরও এমন কিছু স্তর আছে। এই স্তর বিন্যাসের শুরুটা হয় ইসলাম দিয়ে, এর উপরে আছে ঈমান, আর এসবের উপরে তৃতীয় স্তরে আছে ইহসান। আর সাওমের উপরের স্তর হলো সাওমকে উপভোগ করতে পারা এবং এর মাঝে আনন্দ খুঁজে পাওয়া। শুধু বিশেষ বিশেষ বান্দাই এই অনুভূতি উপভোগ করতে পারেন। এই অনুভূতি তখনই বাস্তব হয়ে ধরা দেয়, যদি সাওম পালন করার সময় সাওম পালনকারী ব্যক্তি অনুভব করতে পারেন যে-আল্লাহ তাঁকে দেখছেন। যেভাবে আমাদের প্রিয় নবিজি (সা.) বলেছেন,

“ইহসান হচ্ছে এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করা, যেন আপনি তাঁকে দেখছেন। [সহিহ বুখারী-৫০]

রাসূল (সা.) তাইফে গেলেন। এটা ছিল এমন এক পাহাড় যাতে চড়া বেশ কঠিন ব্যাপার ছিল। যখন তিনি পর্বতচূড়ায় পৌঁছলেন, তাইফবাসী পাহাড়ের নিচে পর্যন্ত তাঁকে প্রস্তরবর্ষণ করতে থাকল। তাঁর শরীর জুড়ে রক্ত ঝরছিল, তিনি ক্লান্ত ছিলেন, হৃদয় গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছিল-তবুও সেই কঠিন সময়ে তিনি বলেছিলেন,

" ও আল্লাহ! আপনি যদি আমার ওপর অসন্তুষ্ট না হন, তাহলে যা হয়েছে তা কিছুই না!

[মাযমাউদ যাওয়ায়িদ-৯৮৫১]

তিনি যা বলেছেন তা যেন ছিল বরফশীতল পানির মতন যা কিনা অসম্ভব পিপাসার্ত মানুষের পিপাসা মেটাতে সক্ষম। সুবহানআল্লাহ! কত সুন্দর উক্তি!

আল্লাহ তাআলা নবুওয়াতের মাধ্যমে নবীকে যে উজ্জ্বল আলো দিয়েছেন, সে আসত উজ্জ্বলতা যেন এই টাজ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এখন অনেকেই হয়তো অলবে এক মানে কি এই যে-ক্ষুধার্ত অবস্থায়ও কেন্দ্রবস্থাতেও আনন্দ আছো। হ্যাঁ, যার থাকাটা শুধু আল্লাহর জন্য হয়, তবে সে অবস্থাতেও আনন্দ আছে। কেউ কেউ কেবল খাওয়ার

মাঝেই আনন্দ খুঁজে পায়। এটা এমন একটা যা ব্যাপারে কাফিরদের আর চতুষ্পদ জন্তর মাঝে মিল আছে।

আল্লহ তা'য়ালা বলেন,

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَاْكُلُوْنَ كَمَا تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ١٢

যারা কুফরী করে তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং চতুষ্পদ প্রাণির মতো ভক্ষণ করে।"
(সূরাহ মুহাম্মাদ ৪৭:১২)

অনেক হাদিসে কুদসী আছে যেখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন সাওম কেবল তাঁরই জন্য। আপনাকে এটা বুঝতে হবে যে, আপনার এই ত্যাগটুকু শুধু আল্লাহর জন্য, আর এটাই হলো ঈমান ও ইহতিসাবের প্রকৃত অর্থ। মক্কার তপ্ত রোদে বেলাল রা. এর উপর চাবুকের আঘাত করা হচ্ছিল এবং এমন পাথরের চাপ দেওয়া হচ্ছিল যা মাংস ভেদ করে হাড় পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। এই তীব্র কষ্টের পরিস্থিডিও বিলাল (রা)-এর জন্য কষ্টকর হতে পারেনি, কারণ বিলাল (রা.) জানতেন যে-এই সবকিছু তিনি আল্লাহর জন্যই করছেন।

একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টা পরিষ্কার করা যায়। ধরুন, একজন তার স্ত্রীর জন্য গিফট কিনতে মার্কেটে গেল। সে এক মার্কেট থেকে আরেক মার্কেটে দৌড়াচ্ছে-হোক বাইরে বৃষ্টি, তুষারপাত অথবা প্রচণ্ড গরম। সে চেষ্টা করছে যেন সবচেয়ে ভালো দামে সবচেয়ে ভালো জিনিসটা তার স্ত্রীকে উপহার দিতে পাবে-এমন কিছু যা তার স্ত্রীর সাথে মানানসই হবে। সে উপহারটি র‍্যাপিং করাল এবং তার স্ত্রীকে দিল।

তারপর সেই স্বামী যখন তার স্ত্রীকে খুশি মনে উপহারটি খুলতে দেখে, তার আনন্দের সীমা থাকে না। স্ত্রীর প্রতি তার ভালোবাসার কারণেই সে তাকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্ট করে, আর এটা করতে পেরে শেষ পর্যন্ত তার কোনো কষ্টের কথাই মনে থাকে না। শপিং এ যাওয়ার কষ্ট, এক মার্কেট থেকে আরেক মার্কেটে ঘোরার কষ্ট, সেই গিফটের

মূল্য যোগানোর জন্য তার হয়তো সপ্তাহ, মাস কিংবা বছরের পর বছর কষ্ট করতে হয়- নিমেষেই সব কষ্টের কথা সে ভুলে যায়।

এমন কী ছিল-যা তার সমস্ত বউকে ভুলিয়ে দিল? শুধু তার প্রিয় মানুষটির হাসিমাখা মুখটা দেখে কেন সে এত কষ্টের কথা ভুলে গেল? এর কারণ- প্রিয় মানুষটির জন্য তার অকৃত্রিম ভালোবাসা।

আমার মায়ের একটা উদাহরণ দিই। আল্লাহ আমার এবং আপনাদের মায়েদের জন্য জান্নাতে প্রাসাদ বানিয়ে দিন। তিনি সারা দিন তাঁর বরকতময় পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে রান্না-বান্না করতেন (বিশেষ করে রামাদানের দিনগুলোতে), সবচেয়ে ভালো এবং মজার খাবারগুলো তিনি বানাতেন। প্রায় সময় এটা হতো পরিবারের জন্য আর কখনও কখনও আমাদের বাসায় আসা শত শত মেহমানের জন্য।

প্রতিদিনের মতো তিনি ফজরের আগে জেগে উঠতেন কিয়ামুল লাইলের জন্য। এরপর আবার সারাটা দিন দাঁড়িয়ে থাকতেন রান্না ঘরে। আল্লাহ তাঁর এই সীমাহীন ত্যাগের জন্য তাঁকে ফিরদাউস আল-আ'লা নসীব করুন।

মাগরিবের পর আমরা আসতাম আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা শ্রম দিয়ে বানানো তাঁর রান্নাগুলো পনের মিনিটেই সাবাড় করে ফেলতাম। যখন তিনি তাঁর স্বামী, তাঁর কন্যা, পুত্র, নাতি-নাতনী এবং মেহমানদের খেতে দেখতেন, তখন তিনি খুব খুশি হতেন। কখনও তাঁকে বলতে শুনিনি যে, আমি ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসব রেখেছি-কখনও না। তিনি বৃদ্ধা হতে লাগলেন এবং তাঁর তীব্র কোমর ব্যাখা সত্ত্বেও তিনি কখনও অভিযোগ করেননি-বলেননি যে তাঁর কষ্ট হচ্ছে-বরং তিনি হাসিমুখে আমাদের প্লেটে আরও খাবার তুলে দিতেন। এসবের জন্য তিনি আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাবেন এটাই ছিল সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা, আর ছিল আমাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা।

এই উদাহরণগুলো হয়তো আমাদেরকে সাওম উপভোগ করার ব্যাপারটা বুঝতে সাহায্য করবে। যখন আপনি আপনার জিহ্বা এবং পাকস্থলীকে তাদের চাহিদা মতো উপকরণ দেবেন, তখন তারা শান্ত হবে। আর যখন আপনি আপনার হৃদয় এবং আত্মাকে তাদের

খোরাক দেবেন, তখন তারাও প্রশান্ত হবে। সাওম উপভোগ করতে হলে তাই আপনাকে আপনার হৃদয় ও মনের চাহিদা পূরণ করতে হবে।

কীভাবে? নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, আপনি কেন সাওম রাখছেন। যদি মনকে বলেন, ওজন কমাতে সাওম রাখছেন-তাহলে কাজ হবে না। যদি বলেন, আমাকে সাওম হাসতেই হবে কারণ এটা আল্লাহর আদেশ-তবে এটাই হবে উপযুক্ত কারণ। শুধু এই কারণেই সাওম পালন করাটা আপনার জন্য ইবাদাত হবে, আর এই ইবাদাতের লক্ষ্য-আল্লাহ যেন আপনার সাওম কবুল করেন। কিন্তু আমরা শুধু আদেশ মানার তা থেকে আরও উপরের স্তরে যেতে চাই। যদি আপনি সাওম পালন করাটা উপভোগ করতে চান, তবে আপনাকে এটা হৃদয়ে গেঁথে নিতে হবে যে-আপনি শুধু মাল্লাহর জন্যই সাওম রাখছেন। আল্লাহ চান যে আপনি তাঁর জন্য সাওম রাখুন।

তাই সাওম পালন করার ফলে আপনার হৃদয়ে এই অনুভূতিটুকু জায়গা করে যেতে যে, আপনি সেই কাজটিই করছেন যা আল্লাহকে খুশি করে। যদি আপনি কাইতে। ভালবাসেন আপনি তা-ই করেন-যা তারা ভালোবাসে এবং তা-ই তাদেরকে দেন যা তারা আপনার কাছ থেকে পেতে চায়। এটাই সত্যিকারের ভালোবাসা আর এই হলে। সর্বোচ্চ চূড়া।

তাহলে কি আল্লাহ আমাদের কষ্ট দিতে চান?

আসলে আল্লাহ চান আপনি যেন সুখে থাকেন। রামাদানে আপনি যা কিছু অঙন করেন-তাকওয়া, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, ভয়, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখা আর নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জয়ী হওয়া-এ সবকিছু অর্জন করতে গিয়ে রামাদনে আপনার খুব সামান্যই কষ্ট হয়। কারণ রামাদানে আসলে খাবার সময়কে শুধু একটু পিছিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করা হয় না। কীভাবে এটা কষ্টের হতে পারে, যখন এই মাসটাই কিনা অসংখ্য মুসলিমের প্রিয় একটি মাস? তারা সবসময় বলে- রামাদানটা বেশ তাড়াতাড়িই চলে গেল। তারা বলে আমরা আমাদের খাবার সময়কে পিছিয়ে দেব, রাত

জেগে সালাত আদায় করব কিন্তু আমরা পরবর্তী রামাদান আসা পর্যন্ত আর অপেক্ষা করতে পারছি না।

তাওহিদকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করুন সাওম পালনের মাধ্যমে, সবকিছু আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে। আমরা সবকিছু করি আল্লাহর জন্য, দানও করি আল্লাহর জন্য। শুধু আমাদের খাবার আব পানীয় ত্যাগ না, বরং আমাদের জীবন, সম্পদ এবং মর্যাদাও শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যাই। যখন আপনি এমনটা করতে পারবেন, তখনই সেই কাঙ্ক্ষিত অনুভূতিটি নিজের মাঝে খুঁজে পাবেন; কারণ এর মাধ্যমে আপনার আত্মা তার আসল খোরাক পেয়ে গেছে। আপনি কাউকে যত বেশি ভালোবাসেন, ততই আপনার মাঝে তাকে খুশি করার প্রেরণা জাগে, আপনি সবসময় সময়-সুযোগ খুঁজতে থাকেন তাকে খুশি করার জন্য। রামাদানের বাইরের দিনগুলোতে এই শুষ্ক ঠোঁট এবং অভুক্ত পাকস্থলী বিরক্তিকর লাগে, এমনকি কখনও কখনও যন্ত্রণাদায়কও মনে হয়। কিন্তু যখন এই একই বিষয়গুলো রামাদানে ঘটে, তখন তার হৃদয় আনন্দে ছেয়ে যায়, যেমনটা নবিজি (ﷺ)-এর ক্ষেত্রে ঘটেছিল তাইফে, তিনি যেমন আল্লাহকে বলেছিলেন,

"যদি তুমি আমার ওপর অসন্তুষ্ট না হও, তবে আমি আর কিছুরই পরোয়া করি না।"

কারণ এই ত্যাগ তো আল্লাহরই জন্য।

পাকস্থলীতে কিছুই নেই, কিন্তু তা অপূর্ণ থাকার কষ্টের অনুভূতি দূর হয়ে যায় এটা জেনে যে, আল্লাহ দেখছেন, এবং তিনি জানেন যে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই তাঁর বান্দা প্রবৃত্তিকে দমন করেছে। যে আল্লাহকে ভালোবাসে, সে অন্য কোনো উপায়ে তার পেট ভরাতে চাইবে না।

এর কষ্ট স্বীকার করবে, তাও আবার বিনয়ের সাথে আল্লাহর কাছে তার সাওম কবুল তোর জন্য এই দুআ করে যে, ইয়া আল্লাহ! আপনি কবুল করুন। কারণ আল্লাহ যদি হায় যাতন কবুল করে নেন, তবে এই ক্ষুধা-তৃষ্ণা এসব কোনো ব্যাপারই না। এচিভালা শুভ, গলা তৃষ্ণার্ত, কিন্তু আপনার হৃদয় ভাবাবেগে পূর্ণ এটা জেনে এবং সেই প্রিনটির

অপেক্ষায় থেকে-যেদিন আপনার সাক্ষাৎ হবে বিশ্বচরাচরের রব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাথে।

আর এটাই এই হাদিসটার অর্থ, "যে সাওম রাখে সে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে যাবে, এখন সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে। [সহিহ মুসলিম:২৭৬৩]

হাশরের দিনে কিছু কিছু লোক তাদের ঘামে নিমজ্জিত থাকবে যার যার গুনাহ অনুযায়ী। কারো কারো চেহারা অন্ধকার হয়ে থাকবে।

"সেদিন (হাশরের দিন) কিছু চেহারা হবে শুভ্র আর কিছু চেহারা হবে অন্ধকারাচ্ছন্ন।"

(সূরাহ আলে-ইমরান ৩:১০৬)

কেউ কেউ তাদের মুখের ওপর ভর দিয়ে হাঁটবে।

এবং আমি তাদের হাশরের দিন একত্রিত করব, তাদের মুখের ওপর, অন্ধ, বোবা এবং বধির।
(সূরাহ ইসরা ১৭:৯৭)

আর সাওম পালনকারীরা? আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময় তারা থাকবে আনন্দে উদ্বেলিত।

মানুষের অন্তর যখন তয় এবং আতঙ্কে কম্পমান, সাওম পালনকারীরা তখন আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য অস্থির হয়ে থাকবে, এই মহা আকাঙ্ক্ষিত সাক্ষাতের জন্য তারা। আর অপেক্ষা করতে চাইবে না।

যারা কখনও ইহসান মানে কী তা অনুভব করেনি, তারা এসব শুনে হাত দিয়ে মাথা চাপড়াতে পারে আর বলতে পারে তোমরা পাগল। সাওম রাখতে হবে তাই রাখব, কিন্তু তা উপভোগ করব কী করে। সবাই এসব বুঝবে না, কারণ ক্ষুধা-তৃষ্ণা একদিকে আর

আনন্দ-আহ্লাদ আরেক দিকে। আপনি দুইটা সম্পূর্ণ বিপরীত জিনিসকে এক করার চেষ্টা করছেন। এটা যেন চুম্বকের দুই উত্তর মেরু আর দুই দক্ষিণ মেরুকে লাগানোর চেষ্টা-যেটা কখনও হবার নয়।

ইবাদতের মাঝে আনন্দ অনেকটা অলৌকিক কিছুর মতো। সবাই এটা বুঝাতে সক্ষম হবে না। শুধু আল্লাহর কিছু সৌভাগ্যবান বান্দারাই এই অটভিকতত অনুধাবনে সক্ষম। যাদের আল্লাহ ইহসান দান করেছেন তারাই এমন মত অনুধাবন করবে এবং নিজের জীবনে প্রয়োগ করারে। আপনার নিয়ত। প্রেরণা হবে এক আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাঁকে ভালোবাসা এবং তাঁকেই সরই শু আপনার লক্ষ্যই এখানে আপনার হাতিয়ার। তাই দৃঢ়তার সাথে সাওমের মা যদি হোন, ঠিকই আপনি সাওমের মাঝে আনন্দ আর প্রশান্তি খুঁজে পাবেন।

এই পৃথিবীতে কষ্ট আর ত্যাগ স্বীকার করার মাধ্যমেই আমরা জান্নাতের যাবো ইনশাআল্লাহ। এই বিষয়টাই ভাবুন, দেখবেন আপনার সাওম কই সেরে আনন্দে রুপ নিবে। কল্পনা করুন যে, এই দুনিয়ার কষ্টগুলো আপনাকে ফিরদাউসের উপরের স্তরে নিয়ে যাবে। আমরা সর্বোচ্চটাই প্রত্যাশা করার এবং আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কখনও দুনিয়া নয়। আপনি পৃথিবীতে যে ত্যাগই স্বীকার করুন না কেন তা আখিরাতে আপনি যা পেতে যাচ্ছেন তার তুলনায় কিছুই নয়। জান্নাত অনেক পাদু এটা মোটেও সস্তা কিছু নয়।

রাসূল (সা.) বলেছেন, আল্লাহর পুরস্কার অত্যান্ত। দামি।
[তিরমিজি:২৪৫০]

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হবার পর আরও কিছু বিষয় আছে যা আপনাতে সাওম উপভোগ করতে সাহায্য করবে। উদাহরণস্বরূপ ধরুন, আপনি একটা বড় রুমে আছেন, ক্ষুধায় আপনার পেট ডাকাডাকি করছে আর আপনার সামনে আছে এক গ্লাস পানি। চিন্তা করুন, তীব্র গরমের দিনে সাওম পালন করছেন, আপনি একাকী আছেন আর খাবার এবং পানি আপনার থেকে মাত্র এক হাত দূরে। সব আপনার কাছে থাকা সত্ত্বেও, আপনি একা হবার পরও যখন ঐ খাবার কিংবা পানি ছুঁয়েও দেখবেন না।

তখন আপনাকে এই ভাবনাটাই আনন্দ দেবে যে- আপনি আপনার নফসের ওপর অনেক শক্তিশালী হয়েছেন এবং আরও জানবেন যে-আপনার দুআর শক্তি এখন কিছুটা জোরদার হবে। কারণ এখন আপনি আপনার দুআয় আপনার এই আমলকে ওয়াসীলা হিসেবে তুলে ধরতে পারবেন।

আপনি দুআয় বলতে পারবেন, ও আল্লাহ। আমি একা ছিলাম, তৃষ্ণার্ত ছিলাম, কেউ জানত না, কেউ আমাকে আটকাতও না। আমি রাস্তার পাশের রেস্টুরেন্টটায় থামাতে পারতাম, কেউ আমাকে দেখতও না, জানতও না। ও আল্লাহ! কখনও কখনও আমি দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম এবং গুনাহেও জড়িয়ে পড়েছিলাম, আমাকে ক্ষমা করে দাও। ও আল্লাহ। আমার এক হাত দূরত্বেই পানি আর বরফ ছিল, শুধু তোমার জন্য আমি ওগুলো এড়িয়ে গিয়েছি। তাই আমাকে চাকরিটা পাইয়ে দাও, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার তাওফিক দাও, আমার অসুস্থতা দূর করে দাও, অথবা আপনার আর যে চাওয়াই থাকুক তার জন্য দুআ করুন। হাশরের দিনে মানুষ ভীষণ আতঙ্কে থাকবে। জাহান্নামকে সামনে নিয়ে আসা হবে, এবং কিছু লোককে সেখানে সরাসরি নিক্ষেপ করা হবে।

"এবং সামনে নিয়ে আসা হবে জাহান্নামকে..।"
(সূরাহ আল-ফাজর (৮৯:২৩)

রাসূল (সা.) চিৎকার করে বলবেন 'ইয়া রবিল সাল্লিম সাল্লিম' আর হাজির হবে জাহান্নাম। সহিহ মুসলিমে ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, "হাশরের দিনে জাহান্নামকে আনা হবে সত্তর হাজার দড়িতে বেঁধে এবং প্রতিটা দড়ি জানাবে সত্তর হাজার ফেরেশতা।"

এমন সময় আপনারা শুনবেন ফেরেশতারা বলছে, আব্দুল্লাহ, সলিহ, জানাল, অমুক, তমুক- তুমি জাহান্নাম থেকে সত্তর হাজার বছর দূরে এবং আরও সত্তর হাজার বছর দূরে এবং আরও সত্তর হাজার বছর দূরে। আপনি কি জানেন কোন কাজের কারণে জাহান্নাম থেকে আপনি সত্তর হাজার বছর দূরে সরে যাচ্ছেন? এ হলো রামাদানের বাইবের দিনগুলোতে আপনার রাখা সাওমগুলো। রামাদানের সাওমের ক্ষেত্রে এই হিসেব আরও বেশি হয়। অন্যান্য বর্ণনায় বলা হয়েছে সেটা আকাশ এবং পৃথিবীর

মধ্যকার দূরত্বের সমান। অর্থাৎ সত্তর বছর গুণ ত্রিশ মোট একুশশো বছর হবে জাহান্নাম এবং আপনার দূরত্ব, আর এটা শুধু একটা রামাদানের জন্য, অন্যান্য নফল সিয়াম বাদ দিয়েই। আপনার এবং জাহান্নামের দুরত্ব হবে হাজার হাজার বছরের। আপনি আসলেই এসবের উপর গভীরভাবে মনোনিবেশ এবং তাফাকুর করার পরও যদি আপনার হৃদয় পুলকিত না হয়, আপনি সাওম উপভোগ না করেন-তবে দুর্ভাগ্য আপনার জন্য!

এসব বিষয় নিয়ে গভীরভাবে ভাবুন, তাহলে আপনার ক্ষুধা আর তৃষ্ণাকে আপনি উপভোগ করা শুরু করবেন। জান্নাতের সামনে লোকেদের ভিড় থেকে তাদের আমল অনুযায়ী প্রবেশ করতে বলা হবে এবং আপনাকে বলা হবে আর-রাইয়ান নামক গেইট দিয়ে প্রবেশ করতে। যদি এটা জেনেও আপনি অনুপ্রাণিত না হন, তবে আর কিসে আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে।

আর-রাইয়ান মানে যা তৃষ্ণা মেটায় এবং সন্তুষ্ট করে। আপনি আল্লাহর জন্য অনেক কিছুই পরিত্যাগ করেছেন, এখন আল্লাহ আপনাকে সন্তুষ্ট করবেন-এটাই হলো আর-রাইয়ানের অর্থ। যখন আপনি বসে বসে এই বিষয়ে তাফাকুর করেন, আপনি গভীরভাবে অনুভব করুন এবং কল্পনা করুন যেন তা হচ্ছে এখনই, তখন তা আপনার ইবাদাতে প্রশান্তি নিয়ে আসবে ইনশাআল্লাহ।

যখন জান্নাতে লোকেরা লেভেল এক, দুই, তিন পর্যন্ত গিয়ে থেমে যাচ্ছে আর আপনি উপরে উঠছেন আর উঠছেন, কেবল আপনার সাওমের কারণে।

যখন আপনি এটা নিয়ে তাফাকুর করবেন, কল্পনা করবেন, হিসেব কষবেন-তখন আপনার হৃদয় প্রশান্তিতে ভরে যাবে-সাওমে পালন তখন আপনার মনে শীতলতা নিয়ে আসবে।

রমাদান আত্মশুদ্ধির বিপ্লব ঘটায়:

রমাদানকে আত্মশুদ্ধির মাস বলা হয় কারণ এটি মানুষের জীবনে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক পরিবর্তনের দরজা উন্মুক্ত করে। রমাদানের প্রতিটি দিক আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক বিপ্লব আনতে সাহায্য করে।

রমাদান মাস আত্মশুদ্ধির বিপ্লব ঘটায় কারণ এটি মানুষের আত্মিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির এক বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি করে। ইসলামে রমাদান মাসকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন, পাপ থেকে বিরত থাকা এবং আত্মসংযমের প্রশিক্ষণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নিচে এর ব্যাখ্যা দেওয়া হলো:

১. আত্মসংযমের শিক্ষা

রমাদান মাসে রোজার মাধ্যমে মানুষ খাদ্য, পানীয় এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়সুখ থেকে বিরত থাকে। এটি মানুষের ভেতরে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা এবং ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এ ধরনের নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তি জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও শৃঙ্খলাবোধ আনতে সাহায্য করে।

২. পাপ থেকে বিরত থাকা:

রমাদানে মানুষ শুধু খাবার থেকে নয়, মিথ্যা কথা, গিবত, শঠতা এবং অন্যান্য খারাপ কাজ থেকেও বিরত থাকার চেষ্টা করে। এ ধরনের আত্মনিয়ন্ত্রণ মানুষকে খারাপ অভ্যাস ত্যাগ করতে উৎসাহিত করে, যা জীবনে নৈতিক উন্নতি আনে।

৩. আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটায়:

রমাদান মাসে বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত, নামাজ, দোয়া ও ইবাদতে সময় কাটানো হয়। এটি আত্মার পরিশুদ্ধি ঘটিয়ে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বাড়ায়।

৪. পরোপকার ও ভ্রাতৃত্ববোধ

রমাদানে দান-খয়রাত ও জাকাতের মাধ্যমে ধনী-গরিবের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করে এবং মানুষের মধ্যে সহানুভূতির অনুভূতি তৈরি করে।

৫. চিরস্থায়ী জীবনের প্রস্তুতি:

রমাদান মানুষকে মনে করিয়ে দেয় যে পার্থিব জীবন ক্ষণস্থায়ী। রমাদানের আমল মানুষের অন্তরে চিরস্থায়ী জীবনের প্রস্তুতির অনুভূতি জাগায়, যা তাকে আরও সৎ ও দায়িত্বশীল হতে উদ্বুদ্ধ করে।

৬. ত্যাগের চর্চা:

রমাদানের অন্যতম শিক্ষা হলো নিজেকে অন্যদের অবস্থানে কল্পনা করা। দিনের দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকা আমাদের শেখায় গরিব, দুস্থ ও অভাবী মানুষের কষ্ট অনুভব করতে। এটি মানুষকে ভোগবাদ থেকে দূরে রাখে এবং ত্যাগের মানসিকতা তৈরি করে।

৭. আত্মবিশ্লেষণের সুযোগ

রমাদান আত্মবিশ্লেষণের জন্য একটি বিশেষ সময়। রোজাদার ব্যক্তি তার অতীত জীবনের ভুলগুলো নিয়ে ভাবার এবং সেগুলো সংশোধন করার সুযোগ পান। এটি পাপ থেকে ফিরে আসা এবং জীবনে আল্লাহর পথে চলার সংকল্প দৃঢ় করে।

৮. শারীরিক ও মানসিক পরিশুদ্ধি:

রোজা শুধু আধ্যাত্মিক নয়, শারীরিক সুস্থতার জন্যও উপকারী। এটি শরীরের অপ্রয়োজনীয় বিষাক্ত পদার্থ দূর করে এবং ইন্দ্রিয়গুলোকে বিশ্রাম দেয়। পাশাপাশি মানসিক প্রশান্তি ও ধৈর্য বাড়িয়ে আত্মশুদ্ধির একটি পূর্ণাঙ্গ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করে।

৯. পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করা:

রমাদান মাসে পরিবারের সবাই একসঙ্গে সেহরি ও ইফতার করেন। এটি পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ভালোবাসা, সম্পর্ক এবং একতা বাড়ায়। পাশাপাশি ঈদুল ফিতরের প্রস্তুতি সবাই মিলে করার মাধ্যমে পারস্পরিক সহানুভূতি এবং ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি পায়।

১০. আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করা:

রমাদানে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা, বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত এবং তাহাজ্জুদসহ নফল ইবাদতে মনোনিবেশ করা হয়। এটি মানুষের আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক আরও গভীর করে এবং আত্মাকে আলোকিত করে।

১১. সমাজের কল্যাণ নিশ্চিত করা:

রমাদান মাসে দান-খয়রাত এবং জাকাত দেওয়ার মাধ্যমে ধনীরা দরিদ্রদের সাহায্য করেন। এটি সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য কমায় এবং সহমর্মিতা সৃষ্টি করে।

১২. নিয়মিততা ও শৃঙ্খলা আনয়ন:
রমাদানে রোজার সময়সূচি মেনে চলার মাধ্যমে ব্যক্তি শৃঙ্খলাবোধের চর্চা করেন। এটি কাজের সময়, ইবাদত এবং বিশ্রামের মধ্যে ভারসাম্য আনতে সাহায্য করে।

রমাদান এক অনন্য সুযোগ, যা আমাদের জীবনকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য পুনর্গঠন করতে সাহায্য করে। এটি কেবল একটি মাসের চর্চা নয়; বরং সারা জীবনের জন্য নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক দিক থেকে উন্নতির পথ দেখায়। রমাদান শেষ হওয়ার পরেও এই শিক্ষাগুলো জীবনে বাস্তবায়ন করলে সত্যিকারের আত্মশুদ্ধির বিপ্লব ঘটানো সম্ভব।
রমাদান এক মাসের জন্য আত্মসংযম ও আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে মানুষকে পাপমুক্ত ও পরিশুদ্ধ হওয়ার সুযোগ দেয়। এটি মানুষকে নিজেকে এবং সমাজকে উন্নত করার একটি বিপ্লবী পথ দেখায়, যা সারা বছরের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

রমাদান কুরআনের সাথে উত্তম সম্পর্ক গড়ে তোলার মাস:

রমাদান মাসকে কুরআনের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার মাস হিসেবে বিবেচনা করা হয়, কারণ এই মাসেই পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

"রমাদান মাস, যার মধ্যে কুরআন নাজিল করা হয়েছে মানবজাতির জন্য হিদায়াত হিসেবে এবং সঠিক পথের দিশা ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী হিসেবে।"
(সুরা আল-বাকারা, ২:১৮৫)

কুরআনের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার কারণ:

১. কুরআন অধ্যয়ন ও তিলাওয়াত:

রমাদান মাসে বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত ও অর্থ অনুধাবনের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) এবং সাহাবিরা এ মাসে কুরআন পড়ার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন।

২.আত্মশুদ্ধি:

রমাদান মাস হলো আত্মশুদ্ধির মাস। কুরআন পাঠ, চিন্তা, এবং তার নির্দেশনা অনুসরণ মানুষকে পাপ থেকে বিরত রাখতে সাহায্য করে।

৩.রাতে তারাবিহ নামাজ:

তারাবিহ নামাজে দীর্ঘ সময় ধরে কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করা হয়, যা কুরআনের গভীর মর্মার্থ উপলব্ধির সুযোগ করে দেয়।

৪.কুরআনের শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা:

রমাদান এমন একটি সময়, যখন কুরআনের শিক্ষাগুলো নিজের জীবনে প্রয়োগ করার এবং আল্লাহর নির্দেশিত পথ অনুসরণ করার চর্চা করা হয়।

যেভাবে কুরআনের সাথে সম্পর্ক বাড়ানো যায়:

১.দৈনিক তিলাওয়াতের পরিকল্পনা:

প্রতিদিন নির্দিষ্ট পরিমাণ কুরআন পড়া এবং তার অর্থ বোঝার চেষ্টা করা।

কুরআনের মর্ম অনুধাবন: তাফসির পড়ে বা আলিমদের কাছ থেকে শিখে কুরআনের গভীরতর শিক্ষা বোঝা।

২.দুআ করা:

কুরআনের দিনির্দেশনা অনুসারে জীবন পরিচালনা করতে আল্লাহর সাহায্য চাওয়া।

৩. পরিবার ও সমাজে কুরআন নিয়ে আলোচনা।

একসঙ্গে কুরআনের আয়াত নিয়ে আলোচনা করা এবং এর শিক্ষাগুলো সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করা।

রমাদান কেবল উপবাসের মাস নয়, বরং এটি কুরআনের প্রতি গভীর মনোযোগ দেওয়ার এবং নিজের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী চলার সংকল্প করার মাস। রমাদান মাসকে কুরআনের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার মাস হিসেবে গুরুত্ব দেওয়ার কারণ ও তা কীভাবে আমাদের জীবনে প্রভাব ফেলে, তা আরও বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে।

৪. রমাদান এবং কুরআনের ঐতিহাসিক সংযোগ:

রমাদান হলো সেই মাস, যেদিন পবিত্র কুরআনের প্রথম ওহি নবী করিম (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ হয়। এই মাসে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানবজাতিকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য কুরআন পাঠিয়েছেন। এটি কুরআনের সাথে রমাদানের আত্মিক সম্পর্কের মূল ভিত্তি।

৫.কুরআনকে হৃদয়ে ধারণ করার সুযোগ:
রমাদান এমন একটি সময়, যখন শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয় এবং মুমিনদের জন্য ইবাদতের পরিবেশ সহজ হয়ে যায়। এই সুযোগে কুরআনের তিলাওয়াত, তাফসির অধ্যয়ন এবং অর্থ বোঝার চেষ্টা করলে অন্তরে আল্লাহর নূর বৃদ্ধি পায়।

৬.কুরআনের শিক্ষা রমাদানে কার্যকরভাবে পালন:
রমাদান আমাদের কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুশীলনের মাস। যেমন:
হয়।

৭.তারাবিহ এবং কুরআন শুনা:

রমাদানে তারাবিহ নামাজে কুরআনের দীর্ঘ অংশ তিলাওয়াত করা হয়। এটি কুরআনের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা বাড়ায় এবং নতুন নতুন বিষয় শিখতে সাহায্য করে।

৮.নিজেকে আত্মশুদ্ধির পথে পরিচালিত করা:
রমাদান কেবল তিলাওয়াতের সময় নয়, বরং কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী নিজেকে সংশোধন করার সময়। কুরআন মানুষকে পাপ কাজ থেকে দূরে থাকতে, আল্লাহর আনুগত্য করতে এবং দুনিয়াবি মোহ থেকে মুক্ত হতে শিখায়। যায়, এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা।

রমাদানে সময় নষ্ট না করা:

রমাদান একটি বরকতময় মাস, যেখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুমিনদের জন্য ইবাদত, তাওবা, ও নেক কাজের অসীম সুযোগ করে দিয়েছেন। এ সময় নষ্ট করা মানে হলো এই অমূল্য সময়ের সুযোগগুলো হাতছাড়া করা, যা আখিরাতের জন্য বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে।

রমাদানে সময় নষ্ট না করার কারণ:

★সময়ের সীমাবদ্ধতা:
রমাদান মাস মাত্র ৩০ দিন বা তার কম। এর প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। কোনো কাজেই এ সময়টি অপচয় করা উচিত নয়, কারণ এ সময়ের নেক আমল বহুগুণ বেশি সওয়াবের অধিকারী।

★ইবাদতের বিশেষ সুযোগ:
রমাদানে রোজা, তারাবি, দোয়া, কুরআন তিলাওয়াত, ও সদকাসহ নানা ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের সুযোগ পাওয়া যায়। যদি সময় নষ্ট করা হয়, তাহলে এই বিশেষ সুযোগ হাতছাড়া হবে।

★তাওবার সময়:
রমাদান পাপ থেকে ফিরে আসার এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার মাস। এ সময় গাফিলতির কারণে কেউ যদি তাওবা থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে সেটি আখিরাতের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

সময় নষ্ট হয় যেসব কারণে:

★অপ্রয়োজনীয় কথা ও কাজ:
গল্পগুজব, গীবত, পরনিন্দা ইত্যাদি সময় নষ্ট করে এবং গুনাহের কারণ হয়।

★ সামাজিক মাধ্যমে অতিরিক্ত সময় ব্যয়:
সামাজিক মাধ্যম বা বিনোদনে সময় অপচয় করা রমাদানের মূল লক্ষ্য থেকে দূরে রাখে।

★অলসতা:অলস হয়ে থাকা এবং ঘুমের অতিরিক্ত সময় ইবাদত করার সুযোগ কমিয়ে দেয়।
সাংসারিক কাজে অতিরিক্ত

★সময়:
ইফতার বা সেহরির প্রস্তুতিতে অত্যধিক সময় ব্যয় করাও ইবাদতের সময় কমিয়ে দেয়।

সময় নষ্ট না করার উপায়:

★পরিকল্পনা করা:
প্রতিদিনের জন্য একটি সময়সূচি তৈরি করুন, যেখানে ইবাদত, কুরআন তিলাওয়াত, দোয়া, এবং অন্যান্য নেক কাজের জন্য নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ থাকবে।

★অপ্রয়োজনীয় কাজ এড়িয়ে চলা:
এমন কাজ বা মানুষের সাথে সময় নষ্ট করবেন না, যা আপনার ইবাদতের পথে বাধা সৃষ্টি করে।

★পরিবারকে সময় দেওয়া:
ইবাদতের পাশাপাশি পরিবারের সাথে বসে কুরআন পড়া, আল্লাহর শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করা ইবাদতেরই অংশ।

★সামাজিক মাধ্যম ও বিনোদনে সংযম:
রমাদানে বিনোদন বা সামাজিক মাধ্যমে কম সময় দিয়ে আল্লাহর ইবাদতে মনোযোগ দিন।

★ইফতার ও সেহরিতে সহজতা রাখা:
ইফতার বা সেহরির আয়োজন অতিরিক্ত সময় খরচ করা এড়ান।

সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার:

★কুরআন তিলাওয়াত: প্রতিদিন কুরআনের একটি অংশ পড়ে অর্থ বোঝার চেষ্টা করুন।

★তাওবা ও দোয়া: বেশি বেশি আল্লাহর কাছে নিজের জন্য, পরিবার ও মুসলিম উম্মাহর জন্য দোয়া করুন।

★নফল ইবাদত: তাহাজ্জুদ, দুআ, নফল রোজা ও অন্যান্য ইবাদতে সময় দিন।
গরিবদের সাহায্য: সাদাকাহ ও দান-খয়রাতে মনোযোগ দিন।

সময় নষ্টের ক্ষতি :

এই পৃথিবীর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই আখিরাতের প্রস্তুতির জন্য। রমাদানে সময় নষ্ট করা মানে হলো আখিরাতের মূলধন নষ্ট করা। আল্লাহ বলেন:
"আমি মানুষ ও জিনকে কেবল আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।"
(সুরা আদ-ধারিয়াত: ৫৬)

রমাদান এমন একটি বরকতময় সময়, যা জীবনে বারবার আসে না। এ মাসের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর ইবাদতে, আত্মশুদ্ধিতে, এবং নেক আমলে কাজে লাগানো উচিত। যারা এই সময় নষ্ট না করে সঠিকভাবে কাজে লাগায়, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করবে।

রমাদানে জিহ্বার সংযম:

সাওমের ক্ষেত্রে পেট বা গোপনাঙ্গকে আকাঙ্ক্ষামুক্ত রাখতে তো হবেই, সাথে অন্য কিছু বিধিনিষেধও মেনে চলতে হয়-যেমন জিহ্বা অর্থাৎ জবানকে সংযত রাখা। রামাদান নামের বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ একটি কোর্স হলো মিথ্যা থেকে বিরত থাকা। জুলুম, গীবত ও কুৎসা রটানো থেকে দূরে থাকা।

নবি করীম (সা.) একটি হাদিসে বলেছেন, "শুধুমাত্র খাদ্যগ্রহণ বা পান করা থেকে বিরত থাকার নাম সাওম নয়, বরং সাওম হলো ফালতু এবং অর্থহীন কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা।"
এগুলো কিন্তু সাওম পালনের অন্তর্ভুক্ত। সহিহ বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে, "কেউ যদি আপনাকে সাওম পালন অবস্থায় অভিশাপ দেয়, নির্বোধের মতো আচরণ করে, তখন আপনি বলবেন, 'আমি সাওম রেখেছি'।"

হাদিসে বাক্যটি দু'বার এসেছে। অর্থাৎ সে যেন বলে, 'আমি সাওম রেখেছি, আমি সাওম রেখেছি।'

অনেকে এই কথাটির আগে আল্লাহুম্মা যোগ করে এই কথাটিকে দুআ বানিয়ে ফেলে, কিন্তু আসলে এটি দুআ নয়। হাদিসে যা আছে তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাই উত্তম, অর্থাৎ এতটুকু বলাই যথেষ্ট-ইন্নী স্ব-ইমুন অর্থাৎ আমি সাওম রেখেছি।

এ সম্পর্কে সহিহ বুখারির আরেকটি বর্ণনায় উল্লেখ আছে, "যারা তাদের কথা ও কাজে মিথ্যাচারিতা পরিত্যাগ করে না, সেই লোকের পানাহার থেকে বিরত থাকা আল্লাহ গ্রহণ করেন না।"

সুনানে আন-নাসাঈ, ইবনু মাজাহ ও আল হাকিমে এ বিষয়ে আরেকটি হাদিস আছে, সেখানে নবিজি (সা.) বলেছেন, "এই ধরনের সাওম পালনকারীর প্রাপ্তি কেবল ক্ষুধা।"

ইবনু মাজাহর অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, “ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ছাড়া তারা আর কিছুই লাভ করে না।"

অর্থাৎ এমন কিছু লোক আছে যারা সাওন যাগে ঠিকই বিশ্ব নিয়ের জন করে না। সাওম পালন করেও এদের প্রাপ্তির খাতা শুন্য, তারা কেবল শূণ্য যাহ পিপাসাই লাভ করে। এ বিষয়ে আয়ও অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। এসব হানিফ শামে কেউ হয়তো বলে ফেরাতে পারে, "ঠিক আছে, যদি কাউকে অভিশাপ দেয়ার কথ বটানো আর মিথ্যা বলার কারণে আমার সাওম নাই হয়েই যায়, তাহলে যেতে আম পান করতে ক্ষতি কী। সেটার করি।" কেউ কেউ আসলেই এরকম ি করে এবং তারা আর সাওম পালন করে না।

কিন্তু এই জিনিসগুলো আপনার মন মতো বুঝলে হবে না। হাদিসগুলোকে সেভাবে বুঝতে হবে, যেভাবে বোঝা উচিত। আলিমরা এই হাদিসগুলো নিয়ে আরাম করেছেন। সত্যি বলাতে, এই ধরনের হাদিসের ব্যাখ্যায় হাম্বলী, শাড়ির এবং অং সবগুলো মাযহাবের অবস্থান মোটামুটিভাবে এক, তবে ব্যতিক্রম হলো গরিষ্ঠতা। যাহিরীরা এই হাদিসগুলোর অতিমাত্রায় বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করে এরা খুব আক্ষরিকভাবে হাদিসগুলোর অর্থ নেয়। অন্য মাযহাবগুলোর মতে, এই হাদিসের অ হচ্ছে, সাওম পালন করেও যদি কেউ গীবত করে বা মিথ্যা বলে, তাহলে সাওম পালনের আছর অর্থাৎ পুরস্কার থেকে

বঞ্চিত হবে, কিন্তু সাওম ভঙ্গ হবে না। আর খারাপ কাজের জন্য গুনাহ তো সে লাভ করবেই, সাথে সাওম পালনের সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। ইমাম আহমাদ বলেন, 'যদি আড্ডাবাজি মরে গীবতের আরণে সাওম ভেঙে যেত, তাহলে আমাদের কারোই সাওম হতো না।"

বাজে কথা বলা, মিথ্যা বলা, কুৎসা রটানো এবং পরনিন্দা করা যদি পুরো বছর স্থায়ই নিষিদ্ধ হয়, তাহলে শুধু রামাদানে কেন এই কাজগুলো না করার ব্যাপারে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়? এর কারণ হলো, রামাদান মাসে আপনি যে ইবাদাত করছেন, সেই ইবাদাত এবং ইবাদাতের উদ্দেশ্যের সাথে এই কাজগুলো পরিপন্থী। পুরো রামাদানে আপনি ভালো কাজ করছেন এবং নিজেকে পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করছেন, কিন্তু পাশাপাশি এমন কিছুও করে বসছেন যা আপনার সাওম পালনের উদ্দেশ্যকে বাধাগ্রস্ত করছে। রামাদানে আপনার ভালো কাজগুলোর পুরস্কার যেমন কয়েকগুণ, তেমনি গুনাহের জন্য শাস্তিও কয়েকগুণ। সাধারণ কোনো দিনে যদি আপনি নিজের জবান সংযত না রাখেন, তাহলে তো গুনাহ হবেই। কিন্তু রামাযানে এই গুনাহ হবে আরো বেশি, কারণ পরিত্র মাসে আপনি গুনছেগুলো করছেন। শুধু তাই নয়, রামাদানে কিয়াম, সালাত ও ইবাদাতের জন্য যে কঠোর পরিশ্রম আপনি করছেন, সেগুলোও ভেস্তে যাবে এই গুনাহের কারণে। এই কারণে রামাদানে জিয়াকে সংযত করার ব্যাপারে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

যারা বলেন, "আমি তো মিথ্যা বলে সাওম নষ্ট করেছি, পুরস্কার লাভের আশা নেই তাহলে খেতে আর পান করতে সমস্যা কী" তাদের উদ্দেশ্যে জবাব হাসা, সাগনি জবান সংযত না করে একে তো গুনাহ করেছেন, সাওমের ইবাদাতের পুরষ্কার থেকেও বঞ্চিত হয়েছেন, আর এখন যদি সাওমটাই ভেঙ্গে ফেলেন তাহলে সাওম ভাঙার অন্যংটাও সাথে যুক্ত হবে। আর এই গুনাহ খুবই ভয়াবহ!

এই ধরনের হাদিস থেকে আমাদের শিক্ষা হলো, নিজের জবান সংযত না করা হলে আমাদের কর্ম ও পরিশ্রম দুটোই বিফলে যাবে। রামাদান হলো একটা ক্যাম্পিং এয় মতো, এই ক্যাম্পিং থেকে আমরা ট্রেইনিং গ্রহণ করব যেন বছরের বাকি দিন গুলোতেও এইসব গুনাহের কাজ থেকে দূরে থাকতে পারি।

কিছু সালাফ বলতেন, "সাওম পালনে সবচেয়ে সহজ কাজ হলো না খেয়ে থাকা।" আসলেই এটা সত্য। সাওম পালনের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য হলো এই ইবাদাতটি সারাদিন ধরে কর। হয়, সূর্যোদয়ের পূর্ব থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। আপনি এর মধ্যে ঘুমিয়ে থাকলেও পুরস্কার পাবেন। কিন্তু যখনই আপনি মিথ্যা বলবেন, গীবত করবেন, আপনার এই পুরস্কারপ্রাপ্তি বন্ধ হয়ে যাবে। জাবির বলেছেন, "যখন তুমি সাওম পালন করবে, তোমার কানও যেন সাওম রাখে, তোমার জিহ্বা যেন গীবত থেকে সাওম পালন করে, তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া থেকে সাওম রাখে।" কাজেই শুধু পেট নয়, সবকিছুকেই খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখার নামই হলো সাওম।

ফালতু বা অর্থহীন কথা বলতে অনেক কিছুকেই বোঝায়। মিথ্যাচার, গীবত, অপবাদ দেওয়া, মানহানি, অভিশাপ দেওয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, মুসলিমদের দোষারোপ করা, এমনকি চিৎকার চেঁচামেচি করাও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। রামাদানে এসবের কোনোটিই করা উচিত নয়। জিহ্বা এক টুকরো ছোট মাসে মাত্র, কিন্তু অনেক বেশি বিপদ ডেকে আনতে পারে দেহের এই ছোট্ট অঙ্গটি। এজন্যই রাসূল (সা.) বলেছেন, যেসব গুরুতর বিষয় মানুষের জাহান্নামে প্রবেশের কারণ, তার একটি হলো জিহ্বা। এই জিহ্বা সবকিছু নষ্ট করে দিতে পারে, সবকিছুকে বরবাদ করে দিতে পারে। আপনার উচ্চারিত একটি কথা আল্লাহর ক্রোধের উদ্রেক করতে পারে এবং আপনাকে অনন্তকালের জাহান্নামে নিয়ে যেতে পারে। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। অপরদিকে এই জিহ্বা এমন এক অস্ত্র, যার সঠিক ব্যবহার আপনাকে সফল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তও করে দিতে পারে।
গীবত কিংবা মিথ্যা অপবাদ কেবল আপনার মুখের জবানের মাধ্যমেই হয়, তা কিন্তু এরা আদেনার চোখের সামান্য ইশারা অথবা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমেও এগুলো হতে পারে। টুইটার , ফেইস বুক কিংবা ইন্টারনেট ফোরামে এই বিষয়গুলো অনেক বাজে রূপ ধারণ করে। অনেকে মনে করতে পারে, স্ক্রিনের এপারে আমাকে তো কেউ দেখছে না, কেউ তো জানছে না আমি কে।

অথচ আল্লাহ বলেছেন,

"সে কি জানে না যে আল্লাহ দেখছেন (সে যা করে)?"

[সূরাহ আলাক্ব ৯৬:১৪]

যারা এমনটা ভাবে, তারা কি জানে না কুরআনে কী আছে? তারা কি আনে না আল্লাহ সব দেখছেন?

"সেদিন তোমাদেরকে প্রদর্শনের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে, তোমায় কোনো কিছুই আর গোপন থাকবে না।"
[সূরাহ আল-হাক্বাহ ৬৯:১৮]

সেদিন আপনার কোনো কিছুই গোপন থাকবে না। এখন হয়তো আপনি নিজেকে গোপন রাখতে পারছেন, কিন্তু কিয়ামতের দিন আপনায় সবকিছু প্রকাশ হয়ে যাবে।

"তাদের কার্যক্রমের হিসাব রাখা হবে এবং সে সম্পর্কে তারা জিজ্ঞাসিত হবে।"
[সূরাহ আয-যুখরুফ ৪৩:১৯]

জবানের মাধ্যমে হোক কিংবা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে, অথবা টুইটারে হোক বা ফেইসবুকে হোক-এগুলোর মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। গীবত গীবতই, মিথ্যাচার মিথ্যাচায়ই, সেটা যেখানেই হোক, যেভাবেই হোক। এগুলোর সবকিছুর জন্যই আপনাকে হিসাব দিতে হবে।

কল্পনা করুন সেই ব্যক্তির কথা, যে জানে যে তার বস তার অফিসে গোপন ক্যামেরা বরাবরে রেখেছে, অথবা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যদি কারো গাড়ি, বাসা এবং ফোনের সব কথোপকথন রেকর্ড করে রাখে এমন নজরদারিতে থাকা ব্যক্তি অবশ্যই তার বলা প্রতিটি কথার ব্যাপারে সচেতন থাকবে। সে সবসময় সতর্ক থাকবে, কারণ তার বস অথবা সিকিউরিটির লোক তাকে লক্ষ করছে। কুরআনে বলা হয়েছে আমাদের ডানে ও বামে দুই ফেরেশতার কথা,

"যখন দুই ফেরেশতা ডানে ও বামে বসে তার আমল গ্রহণ করে। সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তা-ই গ্রহণ করার জন্যে তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে।"

[সুরাহ ক্বাফ ৫০:১৭-১৮]

এ কথা বলবেন না, "আমি আসলে নিজের মনের কথা চেপে রাখতে চাইনি, গোপন রাখতে চাইনি, তাই মনে যা আছে তা প্রকাশ করে দিয়েছি।" না, এই যুক্তিটি ঠিক নয়। তার ব্যাপারে যদি আপনার মনে কোনো কষ্ট বা খারাপ ধারণা থেকেও থাকে, সেটা নিজের ভেতরে রাখাই উত্তম। একটি কথার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসিত হবার চাইতে নিজের মধ্যে বিষয়টি চেপে রাখাই আপনার জন্য কল্যাণকর। মুসলিমদের চিন্তাভাবনা এমন হবে না, বরং ইসলাম যেভাবে শিখিয়েছে, সেভাবেই একজন মুসলিম পরিচালিত হবে-আর এটাই হওয়া উচিত।

আপনার মুখের জবান হয়ে উঠতে পারে আপনার চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারক। আমাদের চূড়ান্ত গন্তব্য যেন জাহান্নাম না হয়, সে জন্যে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার দুই চোয়াল এবং দুই পায়ের মাঝে যা আছে তা হিফাযতের নিশ্চয়তা দেবে, আমি তাকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দেব।" বৈবাহিক সমস্যা, পরিবারে ভাইয়ে-ভাইয়ে সমস্যা, সমাজের অভ্যন্তরীণ সমস্যা, খুনোখুনি এবং আরো অনেক ধরনের সমস্যার পেছনে জিহ্বা অন্যতম একটি নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

আপনার যদি মনে হয়ে থাকে আপনার ঈমান দুর্বল, তাহলে সর্বপ্রথম আপনাকে নিজের জবান সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। দুর্বল ঈমানকে মজবুত ঈমানে পরিণত করার এটি একটি উত্তম পন্থা।

রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের আদেশ করেছেন যেন আমরা শুধুমাত্র ভালো কথা বলি অথবা নীরব থাকি। মুখের কথাকে নিছক হালাল বা হারামের মানদণ্ডে বিচার করা যাবে না। বরং শুধু কল্যাণকর আর উপকারী কথাই আমরা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করব। আর যেটার মাঝে কল্যাণ নেই, আবার ক্ষতিও নেই- সেটা থেকেও বিরত থাকব, আর অকল্যাণকর কথা থেকে তো বিরত থাকতেই হবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) জিহ্বার ক্ষতিকারক দিককে সম্বোধন করেছেন 'মুবিকাত' বলে। 'মুবিকাত' অর্থ বিনাশকারী- যা অবধারিত ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। খারাপ কথাকে আল্লাহর রাসূল অন্যান্য মুবিকাত যেমন-সুদের ব্যবসা, জাদুটোনা, হত্যা এবং নারীর মর্যাদাহানি ইত্যাদি অন্যায়

কাজের একই ক্যাটাগরিতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এতেই বোঝা যায় বিষয়টি কতটা গুরুতর।

কোনো কথা বলার আগে ভালো করে ভাবুন। হাসান আল বাসরি (রহ.) বলেন, "যে তার জবানকে সংযত করতে ব্যর্থ হলো, সে তার দ্বীনকে জানতে ব্যর্থ হলো।"

মনে রাখবেন, আপনার কথা আপনার কাছে বন্দী, বলার আগ পর্যন্ত সেগুলোর উপর আপনার নিয়ন্ত্রণ বয়েছে। একবার মুখ খুললে সেই নিয়ন্ত্রণ আপনি হারাবেন, এরপর আপনি নিজেই আপনার কথার কাছে বন্দী হয়ে যাবেন। একবার বন্দী হয়ে গেলে দুনিয়াতে আর আখিরাতে তার ফলাফল আপনাকে ভোগ করতে হবে।
করা।

নিজের জিহ্বার ব্যাপারে সতর্ক হোন, কারণ জাহান্নামের অধিবাসীদের শাস্তির জন্য এটাই মূলত দায়ী। এই জিহ্বার অসংযত ব্যবহারই কবরের অধিকাংশ শাস্তির জন্য দায়ী। মাঝে মাঝে দেখা যায়, কাউকে যখন বলা হয়, "অমুকের ব্যাপারে কথা বলা বন্ধ করুন।" তখন সে জবাব দেয়, "ভাই, আমি তো সত্য কথাই বলছি, বানিয়ে বানিয়ে কিছু বলছি না। এই যে দেখুন, ইন্টারনেটে তার সম্পর্কে এমন কথা আছে, তার আগের স্বামী বা স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন। এলাকার ইমামও জানে, এলাকার মানুষকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন যা বলছি সত্য বলছি।"

যারা এসব গীবত, মিথ্যাচার আর পরনিন্দা করে বেড়ায়, তাদের করণীয় নিয়ে অনেক কথা হয়। কিন্তু যাদের ব্যাপারে গীবত, মিথ্যাচার আর পরনিন্দা করা হয়, তারা যা করবে। তাদের উচিত মন খারাপ না করে বরং খুশি হওয়া। যখন আপনি শুনয়েন কেউ আপনায় ব্যাপারে খারাপ কিছু বলেছে, আপনি খুশি হবেন, কারণ এর মাধ্যমে আপনি অনেক বোনাস পুরস্কার লাভ করবেন। যারা আপনার পরনিন্দা করেছে, তাদের প্রাপ্য সাওয়াব আপনি লাভ করাবেন আর আপনায় গুনাহের তায় তারা বহন করবে- এটা কি আপনার জন্য আনন্দের সংবাদ নয়? এগুলো বোনাস সাওয়াধ, কারণ এসব পাওয়ার জন্য আপনাকে কোনো চেষ্টাও করতে হয়নি, মুফতে পেরে গেছেন। আর তাই যে মিথ্যা অপবাদ দেয় তাকে আল্লাহর রাসূল (সা.) দেওলিয়া বসে আখ্যায়িত করেছেন,

কারণ তার অর্জিত নেক আমলগুলো সে অন্যদের দিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, যাদের নিয়ে সে মিথ্যাচার করে, তাদের পাপের বোঝা তাষের বইতে হয়। জান্নাতে প্রবেশের আগে কাউকে কাউকে কান্তারাহ নামক স্থানে যেতে হবে। সকল বাধা বিপত্তি এবং পুলসিরাতের পর ঠিক যখন জান্নাতের পথে কদম ফেলার সময় আসবে, তখন যাদের নিজেদের মধ্যে বিরোধ আছে তাদেরকে একাচ লম্বা রাস্তা ধরে যেতে হবে। আল কান্তারাহতে দুই পক্ষকে সকল বিরোধের নিষ্পতি করতে হবে। সেখানে কারো নেক আমল কমে যাবে আর কারো বেড়ে যাবে।

একবার হাসান আল বাসরি (রহ.) তাঁর ব্যাপারে কাউকে খারাপ কিছু বলতে শুনলেন। এই কথা শুনার পর তিনি বাজারে গেলেন এবং সেই ব্যক্তির জন্য কিছু খেজুর কিনে আনলেন। এতে কুমন্তব্যকারী লোকটি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, "যে আপনার ব্যাপারে বাজে কথা বলছে, সমালোচনা করছে, অপবাদ দিচ্ছে, আপনি তাকে খেজুর কিনে নিচ্ছেন।" উত্তরে হাসান আল বাসরি বললেন, "তুমি তো আমাকে তোমার নেক আমল দিয়ে দিয়েছ, তাই বিনিময়ে আমিও তোমাকে কিছু দিচ্ছি।"

এমনিভাবে কিছু মানুষ নিজেদের রামাদানের আমল, লাইলাতুল কদরের ইবাদাত, এমনকি হজ্জের সাওয়াব পর্যন্ত অন্যদেরকে দিয়ে ফেলে।

একবার দুই ভাই-বোন মিলে হজ্বে গেল। ভাইটি তার স্ত্রীকে রেখেই হজ্বে গিয়েছিল, কারণ তাদের অনেকগুলো সন্তানের দেখভাল করতে হয় বলে স্ত্রী যেতে চাননি। বাচ্চাদের দেখাশোনার জন্য সে বাড়িতেই থেকে গেল। হজ্জের সময় সেই ভাই-বোন কোথাও যাচ্ছিল। যেতে যেতে ভাই বোনকে বলল, "তুমি আগাতে থাক, আমি স্ত্রীর জন্য কিছু উপহার কিনে আসছি।" বোনটি একটু তাড়ার মধ্যে ছিল বলে সে বিরক্ত হয়ে ভাইয়ের স্ত্রী সম্পর্কে একটা সামান্য শব্দ উচ্চারণ করল। অথচ ঐ বোন আর তার ভাইয়ের স্ত্রীর মধ্যে কোনোরকম শত্রুতা ছিল না যে তারা একে অপরকে কটাক্ষ করবে, তাদের মধ্যে বেশ ভালোই মিল ছিল। কিন্তু এটা ছিল মুহূর্তের জন্য মুখ ফসকে যাওয়া কিছু শব্দ।

এরপর ঐ ভাইয়ের স্ত্রী একটি স্বপ্ন দেখলেন। স্বপ্নটা অনেকটা এরকম যে, তার ননদ তাকে নিজের কৃত হজ্বটি উপহার হিসেবে দিয়ে দিচ্ছে। মহিলাটি এই স্বপ্ন দেখে তাজ্জব হয়ে গেল এবং একজন শাইখকে ফোন করে বলল, "শাইখা আমি একটা অদ্ভূত স্বপ্ন দেখেছি। আমার ননদ আমাকে তার হজ্ব দিয়ে দিচ্ছে।" শাইখ বললেন, "আপনার ননদ নিশ্চয়ই আপনার ব্যাপারে খারাপ কিছু বলেছে, গীবত করেছে, আর এ কারণে তার হজ্ব আপনি পেয়ে গেছেন।"

যখন ভাই-বোন হজ্ব করে ফেরত আসল, মহিলাটি তার ননদকে স্বপ্নের ব্যাপারে বলল। যেহেতু তাদের মধ্যে কোনো মনোমালিন্য ছিল না, বোনটি তার দোষ স্বীকার করল এবং অনুতপ্ত হয়ে মাফ চাইল। তাদের মধ্যে যথেষ্ট ভালো সম্পর্ক ছিল, তারপরও একটা মাত্র শব্দের কারণে তার সম্পূর্ণ হজ্জ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছিল।

তাহলে চিন্তা করে দেখুন, যারা নিয়মিত মানুষের সমালোচনা করেই যাচ্ছে, এই ব্যাগাবে প্রবন্ধ লিখছে, প্রতিনিয়ত অন্যের সম্মানে আঘাত করছে-তারা প্রতিনিয়ত কী পরিমাণ নেক আমল নিজেদের আমলনামা থেকে হারাচ্ছে!

ওয়াল্লাহি। মুসলিমদের ব্যাপারে গীবত কোনো ফেলনা বিষয় নয়। আপনার বলা মাত্র কয়েকটি শব্দের জন্য বছরের পর বছর ধরে করা ভালো আমলগুলো আরেকজনকে দিয়ে দিতে হবে। মাত্র কয়েকটি শব্দ আর সেটির ক্ষতিপূরণ সারাজীবনের সব নেকী-কী ভয়ংকর ব্যাপার। আল্লাহ এমন পরিণতি থেকে আমাদের হিফাযত করুন।

এগুলো কোনো মনগড়া কথা নয়। ভেবে দেখুন এই গীবতের কারণে মুসলিমদের মধ্যে কী পরিমাণ ক্ষতি সাধিত হচ্ছে তাহলে বুঝতে পারবেন কেন এর শাস্তি এত ভয়াবহ! একটি সহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, যখন রাসুল (সা.) সাফিয়্যা (রা.)-কে বিয়ে করতে যাচ্ছিলেন তখন আইশা (রা.) বললেন, "উনি তো খাটো।" আরেক বর্ণনায় আছে যে, তিনি মুখে সাফিয়্যা (রা.)-কে ঠিক খাটোও বলেননি, শুধুমাত্র হাত নাড়িয়ে বুঝিয়েছিলেন। অত:পর রাসূল (সা.) আইশা (রা.)-কে বললেন, "তুমি যদি এই কথাটি সমুদ্রে নিক্ষেপ করো, তবে তা সমুদ্রকেও পরিবর্তন করে দেবে।" চিন্তা করুন, শুধু একটা শব্দ কিংবা একটু ইশারা, অথচ তার ফলাফল কতটা ভয়াবহ।

অন্যদিকে সমালোচনার শিকার আমার ভাই ও বোনেরা, পাহাড় এবং সমুদ্র সমতুল্য নেকী আপনার। উপভোগ করুন। হাশরের ময়দানে যে নেক আমল আপনার মা. আপনার বাবা এমনকি আপনার নিজের সন্তানও আপনাকে দেবে না! আপনারা তা পাবেন ঐসব লোকেদের কাছ থেকে যারা দুনিয়ায় আপনার সমালোচনা করত, আপনাকে হেয় করত।

একবার আম্মাজান আইশা (রা.) -এর কাছে সংবাদ এলো যে, আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.)-এর ব্যাপারে কিছু লোক বাজে কথা বলে। তখন আইশা (রা.) বললেন, "সুবহানআল্লাহ, তাদের মৃত্যুর পর তাদের আমলের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে, তাই এটি আল্লাহ সুবহানায় ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে তাদের নেকী বৃদ্ধির একটি পদ্ধতি।" আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক (রহ.) বলতেন, "আমি যদি কারো ব্যাপারে গীবত করতাম, তবে আমার পিতামাতার ব্যাপারেই করতাম। কেননা, আমার ভালো আমলের বিনিময় পাওয়ার জন্য তারাই সবচেয়ে বেশি হকদার।"

অপবাদ দেওয়া, গীবত ইত্যাদির ক্ষেত্রে হয় আপনি নিজেই এগুলোর শিকার, অথবা আপনি নিজেই কারো গীবত করছেন অথবা আপনি শুধুই শ্রোতা। আপনার ব্যাপারে যদি কেউ গীবত করে, তবে কষ্ট না পেয়ে সেই পুরস্কার উপভোগ করুন। চিন্তা করুন বিনামূল্যের সেই হজ্জটির কথা যেটি আপনি পেতে যাচ্ছেন, সেই রামাদানটির কথা যার সাওয়াব আপনি পেয়ে যাচ্ছেন কোনো মেহনত না করেই। চিন্তা করুন সেই সময়ের কথা, যখন হাশরের মাঠের কঠিন সময়ে সমুদ্র ও পাহাড় সমতুল্য কর্মফল আপনার নিকট আসতে থাকবে। স্মরণ করুন ঐ কাজের কথা, যা আপনাকে পৌঁছে দেবে জান্নাতুল ফিরদাউসে, অথচ সেই পুরস্কারসমূহের জন্য আপনাকে কিছুই করতে হয়নি।

যারা গীবত করে, অপবাদ দেয় বা ঐ জাতীয় কাজে লিপ্ত, তাদের ব্যাপারে অনেক কথা হয়েছে, এবার তাদের পালা যারা অন্যের করা গীবতের নীরব শ্রোতা। আপনারা যারা এই ধরনের গীবতের মজলিশে থেকে অন্যের গীবত শুনছেন, তাদের করণীয় হলো যত দ্রুত সম্ভব ঐ মজলিশ থেকে সরে আসা, অথবা গীবতকারী মানুষটিকে থামতে

বলা। তারা যদি থামে তবে আপনি তাদের সাথে বসতে পারেন। যদি না থামে, তবে আপনি তখনই সবে যান। শ্রবণকারীরাও গুনাহের ভাগীদার এবং আপনি কিয়ামাতের দিন তাদের সাথেই দণ্ডায়মান হবেন।

কেননা, আল্লাহ একই বিষয়ে বলেন,

আর তিনি কিতাবে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর কোনো আয়াত প্রত্যাখাত হচ্ছে এবং ঐটিকে বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত হয়, তোমরা তাদের সাথে বসো না। নতুবা তোমরাও তাদের মতো হয়ে যাবে। মুনাফিক ও কাফের সকলকেই আল্লাহ জাহান্নামে একত্রিত করবেন।" (সূরাহ নিসা ৪:১৪০)

আপনি নিজে বলেননি, শুধু শুনেছেন। তবুও আপনি তাদের সাথে গীবতে যোগদানকারী হিসেবে গণ্য হবেন। কাজেই, এসব থেকে দূরে থাকুন। আপনার ভাই এবং বোনের সম্মানহানিকে বাধা দিন। একজন মুসলিমের সম্মান রক্ষা করুন। তাহলে আল্লাহ বিচার দিবসে আপনাকে রক্ষা করবেন।

শুধুমাত্র একটা কথা আপনি শুনেছেন বলেই সেটা জড়ানোর কোনো অধিকার আপনাকে দেওয়া হয়নি। বরং আল্লাহর সেসব বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান, যারা গুজবকে ধ্বংস করে দেয়।

আপনি যদি শুধু একজন শ্রোতা হয়ে থাকেন, তাহলে যারা গীবত করে, গুজব ছড়িয়ে মুসলিমদের ক্ষতি করছে- তাদের থামান। কখনো দেখেছেন কাউকে একা একা গীবত করতে? যদি আমি, আপনি এবং সব ভাইবোনেরা গুজব শোনা থেকে বিরত থাকি, তাহলে সে কখনোই নিজের ঘরে বসে বসে গুজব রটাতে পারবে না বা গীবত করতে পারবে না। যে লোকটি আপনাকে অন্যরা কী করছে, না করছে এসব ব্যাপারে
এই সবকিছু জানার পর কেউ কেউ বলবেন, আমি তাওবা করতে চাই, কারণ আমি চাই না অন্য কেউ আমার আমল নিয়ে নিক।

সেক্ষেত্রে, প্রথমত, আপনি তাদের কাছে ক্ষমা চান। যদি এমন হয়ে থাকে যে, তারা অনেক উদার, আপনাকে ক্ষমা করবেন এবং আর কোনো সমস্যা তৈরি হবে না... তাহলে যান এবং ক্ষমা চান। কিন্তু যদি আপনার মনে হয় ক্ষমা চাইতে গেলে বরং আরো বেশি সমস্যার সৃষ্টি হবে, তাহলে এটা করবেন না। কারণ পুরো ব্যাপারটার উদ্দেশ্যই হলো মুসলিমদের মাঝে কষ্ট আর সমস্যা দূর করা। যদি মনে করেন ক্ষমা চাইতে গেলে কষ্ট বাড়বে, তাহলে বরং তাঁর জন্য দুআ করুন, তাঁর সম্পর্কে মানুষের কাছে ভালো কথা বলুন এবং তাঁর নামে দান সাদাকা করুন। এটাই সবচেয়ে ভালো কাজ।

যদি কিছু নির্দিষ্ট মানুষের সাথে তাঁর সম্পর্কে আগে গীবত করে থাকেন, তাহলে সেই মানুষগুলোর সাথেই আবার তাঁর ব্যাপারে ভালো কথা বলুন অথবা তার জন্য দুআ করুন। এর মাধ্যমে আপনি তাঁর অধিকার ফিরিয়ে দিচ্ছেন।

এবার আপনাকে আল্লাহর অধিকার পুরণ করতে হবে। এটা তিনটি ধাপে করতে হবে। আস্তাগফিরুল্লাহ বলুন, সিদ্ধান্ত নিন আর কখনও এমন করবেন না এবং অতীতে যা করেছেন তা ভেবে অনুতপ্ত হোন।

ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করে দেবেন। আর নিজের সাথে নিজে সংকল্পবদ্ধ হোন যে, আপনি আর কখনও এমন কাজের পুনরাবৃত্তি করবেন না।

রমাদানে হারিয়ে যাওয়া ইবাদাতগুলো পুনরুজ্জীবিত করুন

আল্লাহর সাথে যে ব্যবসা করতে চায়, তার সবসময় ফিকির থাকবে কী করে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা যায়। বান্দার ইবাদাত নিজেই আল্লাহর সাথে এক রকমের ব্যবসায়িক লেনদেন। কুরআনে এরকমটাই বলা হয়েছে। আল্লাহ বলছেন,

"নিশ্চয় যারা আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন করে, সালাত কায়েম করে এবং আল্লাহ যে রিযিক দিয়েছেন তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসার আশা করতে পারে যা কখনো ধ্বংস হবে না।"
[সূরাহ ফাতির ৩৫:২৯]

কুরআন তিলাওয়াত করা, সালাত পড়া, প্রকাশ্যে ও গোপনে দান করা-এ সবকিছুই ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত। তাহলে উপরের আয়াতে যে বলা হয়েছে "তারা এমন ব্যবসার আশা করতে পারে যা কখনো ধ্বংস হবে না" -এর মানে কী? আল্লাহ একে এমন ব্যবসায়িক মুনাফা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন যা কখনো ধ্বংস হবে না, যা কখনো ফুরিয়ে যাবে না। এতে কোনো লস নেই, বরং দুদিকেই লাভ।

এটা বেশ সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, বেশিরভাগ লোক কোনো এক ধরনের ইবাদাতে আটকে যায় আর এর বাইরে অন্য কোনো ইবাদাত করে না। ফলে সময়ের সাথে সাথে অনেক ইবাদাত একসময় অপরিচিত ও অবহেলিত হয়ে পড়ে। এমন অপরিচিত হয়ে পড়া ইবাদাতের তালিকা বেশ লম্বা। তবে এর মধ্যে তিনটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত হলো,

ফজরের আগে ইস্তিগফার

প্রথমটি হলো ফজরের (আযানের) আগে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া (ইস্তিগফার করা)। এটি তাহাজ্জুদ ও তারাবীহ থেকে ভিন্ন ধরনের ইবাদাত। আর ইবাদাত তো এটাই যে-বান্দা বিভিন্নভাবে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করবে। আল্লাহ বলেন,

আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখেন। যারা বলে, হে আমাদে পালনকর্তা, আমরা ঈমান এনেছি, কাজেই আমাদের গোনাহ ক্ষমা করে দাও আর আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর। তারা ধৈর্যধারণকারী, সত্যবাদী, নির্দেশ সম্পাদনকারী, সৎপথে ব্যয়কারী এবং শেষরাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী"
[সূরাহ আলে ইমরান ৩:১৫-১৭]

আয়াতের শেষে আল্লাহ বলেন "এবং যারা রাতের শেষ ভাগে ইস্তিগফার করে।”

'সাহার' হলো বাতের শেষাংশ-ঠিক ফজরের আগের সময়। এজন্য সুহুরকে সুহুর বলা হয়-কারণ তা রাতের শেষে করা হয়। কিয়ামুল লাইল, কুরআন তিলাওয়াত এবং যিকির আযকারের পর আপনি হয়তো এখন পরিবারের সাথে সাহরি করার জন্য প্রস্তুত। এব মধ্যেই এসব থেকে একটু সরে গিয়ে ফজরের ঠিক আগে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। এর ফযিলত এত বেশি যে, আপনার উপর এই আয়াত প্রযোজ্য হবে- "এবং যারা রাতের শেষ ভাগে ইস্তিগফার করে।"

রমাদান হলো আরো কিছু নতুন ইবাদাত শুরু করা ও নিজের উন্নতি ঘটানোর এক ঈমানী থেরাপি। ধীরে ধীরে এটা শুরু করুন। ফজরের তিন বা পাঁচ মিনিট আগে ইস্তিগফারের জন্য বসে পড়ন। আবার এই কথা শুনেই অতি উৎসাহী হয়ে ঘণ্টার পর ঘন্টা ধরে এ কাজ করতে যাবেন না। কারণ এটা শয়তানের একটা চাল হতে পারে। কেউ হয়তো একটা ইবাদাতের ফযিলত শুনে উত্তেজিত হয়ে পড়ল, শয়তান তখন তাকে এই কাজে দীর্ঘক্ষণ লাগিয়ে রেখে ইবাদাতের প্রতি তার সব শক্তি আর আগ্রহ শেষ করে ফেলে। ফলে সে এক রাত ইবাদাত করার পরেই সেই ইবাদাত ছেড়ে দেয়। ইবাদাত করা হলো নতুন গাড়ি কেনার মতো। দোকানদার আপনাকে বলে দেবে আস্তে আস্তে ইঞ্জিনের জড়তা কাটাতে। শুরুতেই সত্তর মাইল বেগে চালাতে শুরু করলে হবে না। আস্তে আস্তে শুরু করতে হবে। এক দিনে অনেক্ ইবাদাত করে পরদিন থেকে তা ছেড়ে দেওয়ার চাইতে নিয়মিত অল্প অল্প ইবাদাত করাই উত্তম।

সাহরির সময় অনেকেই হয়তো খাবার টেবিলে বসে অর্থহীন কথাবার্তা বলছে। এমন আলোচনা করছে যাতে বরং পাপের ভাগীদার হতে হয়। আপনি এসব আলোচনা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে ইস্তিগফারে ব্যস্ত হয়ে যান। সত্তর থেকে একশ বার আস্তাগফিরুল্লাহ পড়ুন-যেভাবে রাসূল (সা.) পড়তেন। অথবা অন্য যেকোনোভাবে ইস্তিগফার করুন। আর এটাই হবে আপনার জীবনে এক নতুন ইবাদাতের সূচনা।

যেকোনো সময়েই ইস্তিগফার করা যায়। কিন্তু এই সময়টার ব্যাপারে আল্লাহ কুরআনে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন। এটা করে আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারেন- যাদের প্রশংসা আল্লাহ কুরআনে করেছেন। ইনশাআল্লাহ এই আমলটির মাধ্যমে আপনি আল্লাহর ক্ষমা পেয়ে যাবেন।
আপনি গুনাহ থেকে বাঁচতে চান? গুনাহের শাস্তি থেকে দুনিয়া এবং অখিরতে নিরাপদ থাকতে চান? আল্লাহ বলেন,

“তাছাড়া তারা যতক্ষণ ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে আল্লাহ কখনও তাদের উপর আযাব দেবেন না।"
(সূরাহ আনফাল ৮:৩৩)

ইস্তিগফারের মাধ্যমে আপনার উপর আল্লাহর রহমত নেমে আসে। আল্লাহ বলেন, "কেন তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছ না যেন তোমাদেরকে রহমত করা হয়?"
(সূরাহ নামল ২৭:৪৬)

আল্লাহর রহমত আপনার সাথে থাকলে আপনার আর কী-ই বা প্রয়োজন। এখন বলুন এত এত পুরস্কারের জন্য এইটুকু কষ্ট কি করা যায় না? রামাদানের বরকতময় দিনেই তা শুরু করুন এবং ফজরের আগে ইস্তিগফারকে অভ্যাসে পরিণত করার দৃঢ় সংকল্প নিন। ফজরের একটু আগে ঘুম থেকে উঠে ইস্তিগফার করুন। জিহবা দিয়ে শুরু করুন আর খেয়াল রাখবেন হৃদয় যেন জিহ্বার সাথে তাল মিলিয়ে চলে। লেগে থাকুন এবং আল্লাহর কসম-আপনি পরিবর্তন টের পাবেন। এতে সন্দেব করার মানে আপনি কুরআন নিয়ে সন্দেহ করছেন।

কিন্তু আল্লাহ কেন ভোরের ঠিক আগের সময়টাকেই বিশেষ গুরুত্ব দিলেন? আমর জানি ইস্তিগফার যে কোনো সময়েই করা যায়। কিন্তু এই সময়ের বিশেষ গুরুত্ব বেন। কারণ এটি হলো দিনের শুরু। আপনার দরকার পরিচ্ছন্ন একটি শুরু, যাতে আত্মার আপনার দিনকে বারাকাহ দিয়ে ভরে দেন, এ থেকে বঞ্চিত না করেন। দিন শুরু করার মুহূর্তেই আপনি (ক্ষমা পাওয়ার মাধ্যমে) পরিচ্ছন্ন আমলনামা নিয়ে শুরু করছেন, ফলে আল্লাহ

আপনার সারা দিনে বারাকাহ দেবেন। আপনি দুনিয়াবি কাজের দিকে যাচ্ছেন, আল্লাহ চান আপনি যেন আপনার জীবনের আসল উদ্দেশ্য মাথায় রাখেন। তাই দিনের শুরুতেই ইস্তিগফার করুন। কারণ রাতের শেষ তৃতীয়াংশের এই পুরোটা সময়-ই বরকতময়।

তাফাক্কুর

দ্বিতীয় যে ইবাদাতটি আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি তা হলো তাফাকুর-গতীর চিন্তাভাবনা করা। আল্লাহর নামসমূহ, সত্তা, গুণাবলী ও ক্ষমতা নিয়ে চিন্তাভাবন করা। আল্লাহর নিদর্শনসমূহ, আকাশ, জমিন, পাহাড়, দিন, রাত, বাতাস, কুরআনের আয়াত নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা। আল্লাহর সৃষ্টি ও সৃষ্টিক্ষমতা নিয়ে ভাবা।

চিন্তা করা? হ্যাঁ, চিন্তা করা। হয়তো মনে হতে পারে এসব তো সুফীদের কাজ কারবার। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই এমন কিছু না, কারণ এই ইবাদাতের কথা কুরআনেই আছে।

আল্লাহ বলেছেন,

"তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও; নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল।"
(সূরাহ নূহ ৭১:১০)

যারা ক্ষমা চায়, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন। আপনার যদি আর্থিক সমস্যা থাকে, যদি নিঃসন্তান দম্পতি হয়ে থাকেন, ইস্তিগফার হলো এ সবকিছুর ঔষধ-কুরআনে স্পষ্ট আয়াত দ্বারা তা প্রমাণিত। আর এই ইস্তিগফারের উত্তম সময় হলো ফজরের আগে। আল্লাহ বলেন,

"আর বলেছি, 'তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও; নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, আর তোমাদেরকে ধন- সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের জন্য বাগ-বাগিচা দেবেন আর দেবেন নদী-নালা।"
(সূরাহ নূহ ৭১:১০-১২)

আপনি ক্ষমতা চান? সমাজে একটি ভালো পজিশনে যেতে চান বা চাকরিতে পদোন্নতি চান? ইউনিভার্সিটিতে এডমিশন নিতে গিয়ে বারবার ব্যর্থ হচ্ছেন? আল্লাহর কসম! ইস্তিগফার করুন আর ফলাফল দেখুন। আল্লাহ বলেন,

"আর হে আমার কওম! তোমরা (তোমাদের পাপের জন্য) তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁরই প্রতি নিবিষ্ট হও। তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদেরকে আরও শক্তি প্রদান করে তোমাদের শক্তিকে বর্ধিত করে দেবেন।" (সূরাহ হুদ ১১:৫২)

আল্লাহ বলছেন, আরও শক্তি প্রদান করে শক্তিকে আরও বৃদ্ধি করে দেবেন। এটা হতে পারে এমনকি চাকুরি, পদোন্নতি বা ইউনিভার্সিটি এডমিশনও।

জীবনকে উপভোগ করতে চান? তাহলে দেখুন আল্লাহ কী বলেছেন,

"আর তোমরা নিজেদের পালনকর্তা সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অনন্তর তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ কর। তাহলে তিনি তোমাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ দান করবেন।"
(সূরাহ হুদ ১১: আয়াত ৩ এর প্রথমাংশ)

ইবনু কাসির (রহ.) বলেন, এটি হলো দুনিয়ার জীবনে।
আয়াতের পরের অংশে আল্লাহ বলছেন,

"এবং অধিক আমলকারীকে বেশি করে দেবেন।"

(সূরাহ হুদ ১১: আয়াত ৩ এর বাকি অংশ)

এটি হলো আখিরাতের জীবন। আর এভাবে ইস্তিগফারের মাধ্যমে আপনি উভয় জীবনেই সফলতা অর্জন করতে পারবেন।

আল্লাহ বলেন,

"নিশ্চয় আসমান ও জমিন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে জ্ঞানীদের জন্য আছে নিদর্শন।"
(সূরাহ আলে ইমরান ৩:১৯০)

আল্লাহ পরের আয়াতে বলছেন যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে। আল্লাহ বলছেন, "ইয়াতাফাকারুন।"

এই তাফাক্কুর মানে কী? তা হলো চিন্তা করা। তারা আসমান ও জমিনের সৃষ্টি নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করে। তারা যখন এ নিয়ে ভাবনাচিন্তা করে-এই চিন্তা তাদের কোথায় নিয়ে যায়? আল্লাহ আয়াতের পরের অংশে বলেন,

"হে আমাদের রব্ব। আপনি এসব বৃথা সৃষ্টি করেননি; আপনিই পবিত্রতম! অতএব আমাদেরকে জাহান্নাম হতে রক্ষা করুন।"
(সূরাহ আলে ইমরান ৩:১৯১)

তারা যখন চিন্তাভাবনা করে, তখন তাওহিদ নিয়ে সঠিক উপসংহারে আসে। এটি তাদের মনে তাওহিদ প্রতিষ্ঠা করে। কুরআনে এরকম শত শত আয়াত আছে-যা চিন্তাভাবনা করতে উৎসাহিত করে। আল্লাহ বলছেন,

"আর তিনিই জমিনকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে সুদৃঢ় পর্বতমালা ও নদ-নদী স্থাপন করেছেন। আর প্রত্যেক প্রকারের ফল তিনি জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি

রাত দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন। নিশ্চয় যে কওম চিন্তাভাবনা করে, তাদের জন্য এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে।" (সূরাহ রা'দ ১৩:৩)

পরের আয়াতেই আল্লাহ আরও বলছেন,

"আর জমিনে আছে পরস্পর পাশাপাশি ভূখণ্ড আঙুর-বাগান, শস্যক্ষেত, খেজুর গাছ, যেগুলোর মধ্যে কিছু একই মূল থেকে উদগত আর কিছু ভিন্ন ভিন্ন মূল থেকে উদগত, যেগুলো একই পানি দ্বারা সেচ করা হয়, আর আমি খাওয়ার ক্ষেত্রে একটিকে অপরটির তুলনায় উৎকৃষ্ট করে দেই, এতে নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা ভাবনা করে।" (সূরাহ রা'দ ১৩:৪)

শরীরের সাথে আত্মা যেভাবে চলে-এই ইবাদাতও আপনার অন্যান্য ইবাদাতের সাথে সবসময় পাশাপাশি চলবে। তাফাকুর দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু নয় বরং এটা হারিয়ে যাওয়া এক ইবাদাত। তাফাকুরের মাধ্যমে আমাদের বন্ধ অন্তর উন্মুক্ত হয়। পাপের যে কালিমা দিয়ে অন্তর ঢেকে গিয়েছিল-তাফাকুরের মাধ্যমে তা ধুয়ে মুছে কলব উজ্জ্বল হয়ে যায়। এই ইবাদাত কুরআনের অর্থ অনুধাবন করার জন্য অন্তরকে উন্মুক্ত করে দেয় আর ঈমান বৃদ্ধি করে। এই ইবাদাত আপনার মাঝে আল্লাহর প্রতি তরসা, ভয়, ভালোবাসা, আশা, নির্ভরতা ও ক্ষমাপ্রার্থনা বৃদ্ধি করবে। আপনার কঠিন অন্তরকে নরম করবে। যখন আপনি আল্লাহর ক্ষমতা নিয়ে ক্রমাগত চিন্তা করবেন-তা আপনাকে বিনয়ী করবে। যখন আপনি আল্লাহর দয়া ও ক্ষমাপরায়ণতা নিয়ে ভাববেন-তা আপনাকে আরো বেশি বেশি ভালো কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করবে। সাবান যেভাবে ময়লা পরিষ্কার করে, তাফাকুর ও আপনার কলবের ময়লা দূর করে।

আপনি যা কিছু দেখেন-তার সবকিছু নিয়েই গভীর চিন্তা করার অভ্যাস গড়ে তুলুন। আবু সুলাইমান আদ দারানি (রহ.) বলেন, "আমি যখনই ঘর থেকে বেরিয়ে কিছু দেখেছি, তখনই তাতে আল্লাহর দয়া ও ক্ষমতা নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছি।” যা কিছুই তিনি দেখতেন-তাতে আল্লাহর দয়া বা তার উপর আল্লাহর ক্ষমতা নিয়ে ভাবতেন। যখনই আকাশের দিকে তাকাবেন, ভাববেন স্তম্ভ ছাড়া এই আকাশকে কে যারে রেখেছেন। আকাশের দিকে দেখুন, তারপর আপনার ঘরের দেয়ালের দিকে দেখুন।

প্রতি মাসে কিছু না কিছু মেরামত করতে মিস্ত্রী ডাকা লাগে। অথচ আকাশের মরো এত বড় সৃষ্টিকে আল্লাহ বছরের পর বছর অটুট রেখেছেন। ঘর বা মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর যখনই আকাশের দিকে তাকাবেন, চিন্তা করবেন-যে আল্লাহ এএ আকাশকে বানালেন, তিনি আপনার এইমাত্র করা দুআকে কবুল করতে সক্ষম। এটি আপনার হৃদয়কে আশা ভরসা দিয়ে ভরিয়ে তুলবে।

একটু সময় নিয়ে আখিরাতের দৃশ্য কল্পনা করুন। আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক (রহ.) একবার সাহাল ইবনু আলি (রহ.) এর কাছে যান। তিনি সাহাল ইবনু আলিকে ভাবনায় মগ্ন দেখতে পান। আজ আপনি কাউকে ভাবনামগ্ন দেখলে তাকে সম্বিত ফিরে পেতে বলবেন। আর আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক সাহালকে জিজ্ঞেস করলেন তাঁর ভাবনা। তাঁকে কোথায় নিয়ে গেল। সাহাল বললেন, "আমি পুলসিরাতের উপর ছিলাম।" সাহাল ভাবছিলেন জাহান্নামের উপর স্থাপিত পুলসিরাত তিনি কী করে পার হবেন তা নিয়ে। মুসনাদে আহমাদ ও তিরমিযির এক হাদিসে আনাস (রা.) রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, "আখিরাতে আমি কোথায় আপনার সাথে দেখা করব, যাতে আপনার শাফাআত পেতে পারি?" রাসূল (সা.) বললেন, "তুমি আমাকে পুলসিরাতের যারে দেখবে।" তিনি বললেন, "যদি সেখানে না পাই?” তিনি (সা.) জবাব দিলেন, "তাহলে মীযানের কাছে।" তিনি বললেন, "যদি সেখানেও না পাই?" তিনি (সা.) বললেন, "তাহলে হাউজে কাউসারের ধারে।"

আপনার কি মনে হয় আখিরাতের ব্যাপারে দীর্ঘ সময় যাবত গভীর চিন্তা ভাবনা না করলে এমন প্রশ্ন কেউ করতে পারে? আপনার উপর আল্লাহর অনুগ্রহসমূহ নিয়ে চিন্তা করুন। জান্নাতে আপনার প্রাসাদ আর আশেপাশের প্রতিবেশী কেমন হবে-তা নিয়ে ভাবুন। জান্নাতে আপনার বাড়ির সামনের আর পেছনের বাগান কেমন হবে, আপনার প্রাসাদের ছাদ কত বড় হবে, ভাবনাহীন এক জীবনে আপনার পরিবারের সাথে পুনর্মিলিত হওয়ার পর আপনার অনুভূতি কেমন হবে, তা নিয়ে ভাবুন।

দুনিয়া নামক এই জেলখানার দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলতে এসব ভাবনা কাজে দেবে। এটি আপনার মনে প্রশান্তি এনে দেবে। আল্লাহর দিদার লাভের ব্যাপারে ভাবুন-এটি আপনার মাঝে তাঁর প্রতি ভালোবাসা বাড়িয়ে দেবে, তাকওয়া বৃদ্ধি করবে। এটি শয়তানের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করবে-কারণ আপনি আল্লাহর সাথে দেখা

করতে চান। জাহান্নাম নিয়ে ভাবুন, সেখানকার অধিবাসীদের দুর্দশা নিয়ে ও তাদের শাস্তি নিয়ে ভাবুন। এটি আপনার অন্তর নরম করবে, অতীত পাপের জন্য অনুশোচনা তৈরি করবে, তাওবা করতে উৎসাহ যোগাবে, ঈমান ও তাকওয়ার সাথে নতুন জীবন গড়ার প্রত্যয় জাগাবে। এই ইবাদাত আপনার মাঝে আল্লাহর প্রতি ইয়াকীন (নিশ্চয়তা) বৃদ্ধি করবে।

আধুনিক সভ্যতা থেকে বিচ্যুত আর অশিক্ষিত এক বেদুইন যখন তাফাক্কুর করছিল, তখন তাকে এই গভীর চিন্তাভাবনা এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল যার ব্যাপারে আজকের আধুনিক শিক্ষিত লোকদের কোনো ধারণাই হবে না।

উটের বিষ্ঠা দেখে বোঝা যায় এখানে উট ছিল, পায়ের ছাপ দেখে বোঝা যায় এখান থেকে কেউ হেঁটে গিয়েছে। তারা ভরা বিশাল আকাশ আর উত্তাল সমুদ্র দেখে বোঝা যায় সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান আল্লাহর অস্তিত্ব আছে। এই তাফাকুরের ফলেই ঐ বেদুইন আল্লাহর অস্তিত্ব অনুধাবন করেছিল।

তাবাত্তুল

তৃতীয় ও সর্বশেষ অবহেলিত বিষয় হলো দুনিয়াবি সব বিষয় থেকে নিজেকে পৃথক করে আল্লাহর দিকে যাওয়া। এই ইবাদাতের ব্যাপারেও কুরআনে বলা আছে। আল্লাহ বলছেন,

"আর তুমি তোমার রবের নাম স্মরণ কর এবং একাগ্রচিত্তে তাঁর প্রতি নিমগ্ন হও।"
(সূরাহ মুযযাম্মিল ৭৩:৮)

নিজেকে আল্লাহর জন্য পুরোপুরি সমর্পণ করে দেওয়া। মারইয়াম (খল। এর একটি ডাকনাম ছিল আল-বাতুল। এই নামটি এসেছে তাবাতুল থেকে। তিনি নিজেকে দুনিয়া থেকে পৃথক করে রেখেছিলেন, যাতে তিনি আল্লাহর ইবাদাত করতে পারেন। এই

হলো তাবাহুল। এর অর্থ আবার এই না যে আপনি কোনো গুহার ভেতরে গিয়ে সব কাজ ছেড়ে ছুড়ে বসে থাকবেন।

তিন রকমের তাবাস্তুল আছে। একটা হলো খ্রিষ্টান ধর্মযাজকরা যা করে। তারা দুনিয়াবি প্রয়োজনীয় সব কাজ ফেলে, বিয়ে না করে, দূরে কোনো গীর্জায় অবস্থান করে। এটা ইসলাম নয়। আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি জানেন তার জন্য কোনটা উপযোগী। আর বিয়ে করা ইসলামের অংশ। খ্রিষ্টান ধর্মযাজকরা যেভাবে গীর্জায় নিজেদের আবদ্ধ করে রাখে, তাতে করে একনিষ্ঠ ইবাদাতকারী না-বরং শিশুকামী তৈরি হয়। তারা এই বিষয়টা এখন বুঝতে পারছে, যা ইসলাম আমাদের চৌদ্দশ বছর আগেই শিখিয়ে দিয়েছে। তারা এখন তাদের পদ্ধতি পাল্টাতে চাচ্ছে অথচ ইসলাম আমাদের আগেই তা বলে দিয়েছে। কারণ আমাদের জীবনবিধান আসে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর কাছ থেকে যিনি আমাদের চাহিদা ও প্রয়োজন বোঝেন।

দ্বিতীয় প্রকারের তাবাতুল হলো-দিনের একটা নির্দিষ্ট অংশ পৃথক করে নেয়। বা বাতের এক তৃতীয়াংশকে নির্দিষ্ট কবে নিয়ে আল্লাহর কাছে একান্তে ইবাদাত করা।

দুনিয়াকে পেছনে ফেলে আল্লাহর জন্য সময় ব্যয় করুন। পাঁচ মিনিট, বিশ মিনিট, যা ই হোক না কেন। ইবাদাত, সালাত, যিকির, দুআ, কুরআন তিলাওয়াত করা- ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহর জন্য নিজেকে সমর্পণ করে দেওয়া হলো তাবাত্তুল। আর দিন ও রাতের মধ্যে তাবাড়ুলের উপযুক্ত সময় হলো রাতের শেষ এক-তৃতীয়াংশ।

তৃতীয় প্রকাবের তাবাত্তুল হলো মনকে আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণরূপে সমর্পণ করে দেয়া- যে নিয়ামত উম্মাহর খুব কম মানুষই পেয়ে থাকে। শারিরীকভাবে তারা আপনাদের মাঝে উপস্থিত আছে, কিন্তু তাঁর মন ঘোরাফেরা করছে আসমানী বিষয়াদির ভাবনায়। এমন মানুষরা আপনার সাথে কথা বলার সময় আপনার মনে হবে তাদের পূর্ণ মনোযোগ তার কথার দিকে, কিন্তু আসলে মনে মনে সে ভাবছে যে কথাগুলো আমি বলছি তা কি হালাল না হারাম? এটা কি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবে নাকি অসন্তুষ্ট করবে? বাহ্যিকভাবে তাদেরকে দেখে কোনো পার্থিব কষ্টের কারণে দুঃখী মনে হতে পারে। কিন্তু অন্তরে তারা আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরকে গ্রহণ করে নিয়ে খুশি ও সন্তুষ্ট আছে।

মোটকথা হলো, তিনি হলেন এমন ব্যক্তি যিনি শারীরিকভাবে আপনার সাথে আছেন, কিন্তু আত্মিকভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য গভীর চিন্তায় বিভোর। তিনি একই সাথে উপস্থিত ও অনুপস্থিত। এটি ইহসানের স্তরসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ যেন আমাদেরকেও এই স্তরে উন্নীত হওয়ার তাওফিক দেন।

রামাদান মাসে আমলে মনোযোগী হওয়ার উপায়

কয়েক সপ্তাহ আগে এক মঙ্গলবারের কথা। আমি প্রচণ্ড ব্যস্ত। ডকুমেন্ট লিখে শেষ করতে হবে, প্রিন্ট করতে হবে, তারপর কপি, ফাইলিং কত কি কাজে মিনিট আর ঘণ্টার সাথে পাল্লা দিয়ে কাজ করে যাচ্ছি আমি। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে যতোটা বেশি কাজ করে ফেলা যায় আরকি। সূর্য ডোবার সময় বাড়ির পথ ধরলাম। সূর্য ডুবছে, আকাশ প্রায় কালো হয়ে যাচ্ছে, এমন সময় আমার খুশ হলো যে সারাদিন কিচ্ছু মুখে দেইনি। একেবারে ফজরের পর থেকে কোন কিছুই খাওয়া হয় নি আমার। কিন্তু আমি সাওম পালন করছিলাম না। তবুও ক্ষুধার যন্ত্রণা সাবাদিনের মধ্যে একবাবও আমাকে ভোগায় নি।

কিন্তু আগের দিন এরকম হয় নি। সেদিন ঠাণ্ডায় কাঁপছিলাম, ছিলাম ক্ষুধার্ত, তন্দ্রাকাতর আর একইসাথে সিয়ামরত। বারবার ঘড়ি দেখছিলাম আর ভাবছিলাম আর কত মিনিট, কত ঘণ্টা বাকি মাগরিবের আযান আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করার।

জিজ্ঞেস করতেই পারেন, এই দুইদিনের মধ্যে তফাতটা ছিল কোথায়?

উত্তরটা হচ্ছে: লক্ষ্যে।

প্রথম দিন আমার একটা ডেডলাইনে পৌঁছুবার দরকার ছিল। হাতের কাজ শেষ করবার তাড়া ছিল আমার। আমার একটা লক্ষ্য ছিল সেদিন। এটা ছিল ডু অর ডাই পরিস্থিতি।

আর যেদিন সিয়ামরত অবস্থায় ছিলাম সেদিন আমার লক্ষ্য ছিল মাত্র একটাই- খাবার। আমার ইচ্ছে ছিল যত জলদি পারা যায় খাবারটা আমার পেটে পড়ুক আর আমাকে উষ্ণতায় ভরিয়ে দিয়ে আবারো সুখী করে তুলুক।

আরো একটা রামাদান আমাদের দোরগোড়ায়। এই সময়ে যে প্রশ্নটা এক নাম্বারে উঠে আসে সেটা হচ্ছে: আমাদের লক্ষ্যটা কী আসলে?
আমরা কি উদ্বিগ্ন হয়ে প্রতি ঘণ্টায় ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাকবো? আমরা কি কেবল ক্যালেন্ডাবে আরো একটা দিনের উপর টিক দিতেই সাওম পালন করবো? ৩০ দিন শেষে কুরআন খতম করতে হবে, এরকম কোন বাধ্যবাধকতার অনুভূতি নিয়ে কি আমরা কুরআনের জুযের পর জুয পড়েই যাবো? আমরা কি তারাবিহতে দাঁড়াবো শুধু আমাদের সমাজ কিংবা পরিবারকে খুশি করার জন্য?

এভাবেই একটার পর একটা রামাদান আসে আর যায়, আর আমাদের ঈমানের মানদণ্ড একেক সময়ে একেক স্তরে উঠানামা করতেই থাকে আর করতেই থাকে। সম্ভবত, আমাদের ইবাদাতগুলো এখন স্রেফ কিছু আচার অথবা প্রথায় রূপ নিয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে আমরা রামাদানকে চিনে থাকি। এটা একটা বিপজ্জনক আর পিচ্ছিল ঢালের মত। কারণ এর মাধ্যমে এটাই প্রমাণ হয়ে যায় যে আমাদের কাজের সাথে খুব সামান্যই চিন্তার সংযোগ থাকে, এই সামান্য চিন্তাও অনেকের মধ্যে আছে কিনা সন্দেহ। সিয়ামরত অবস্থায় অফিসে যাওয়া আমাদের জন্য হয়ে যায় কেবলই খালি পেটে অফিসে যাওয়ার নামান্তর। ক্ষুধার প্রতিটি আঘাতের সময় আমরা ভুলে যাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে। আমরা ভুলে যাই-

"হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববতীদেরকে দেয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হতে পারো।"
[সূরা বাকারাহ, আয়াত-ক্রম: ১৮৩]

আমরা ক্ষুধার আঘাতে ভেতরে ভেতরে একেবারে অস্থির হয়ে যাই, কাতরাতে শুরু করি। আর আমাদের খালি পেটকে ইফতারের সময় মজার মজার খাবারে ভরপুর করে

তোলার চিন্তায় সান্ত্বনা দেই। ফলাফল দাঁড়ায় এটাই যে, আমাদের সিয়াম অর্থহীন হয়ে যায়।

ইন্টারেস্টিং বিষয়টা হল যে, সিয়াম সম্পর্কিত এই আয়াতে তাকওয়ার অর্থ করা।

মনকে লক্ষের প্রতি নিবদ্ধ করা

জাস্ট ফোকাস করুন। নিজেকে বর্তমানে নিয়ে আসুন এবং সত্যিকার অর্থে এটার ব্যাপারে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করুন। যখন সাহরীর জন্য ঘুম থেকে উঠবেন, তখন ভারী খাবারদাবার দিয়ে সাহরী করবেন না। বরং সাহরি করুন একটা মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। ঘুম থেকে ওঠার প্ল্যান করুন। কারণ এটা আমার রাসূল-এর একটা সুন্নাহ আর এটার মধ্যে বারাকাহ আছে, কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.) এমনটাই উল্লেখ করেছেন-

"তোমরা সাহরী গ্রহণ করো, কারণ এতে বারাকাহ রয়েছে।"
[বুখারি হাদিস ক্রম: ১৯২৩]

রাতের বেলা ঘুমানোর ব্যাপারে কঠোর হন। ঘুমানোর সময়ে একটা এলার্ম সেট করে নিন যাতে সেটা আপনাকে দ্রুত ঘুমিয়ে পড়ার ব্যাপারে স্মরণ করিয়ে দেয়। এতে করে আপনি বিশ্রাম পাবেন এবং সতেজ হয়ে ঘুম থেকে উঠবেন। একইসাথে আগামী দিনের সমস্ত পুরস্কার লুফে নেবার জন্যও প্রস্তুত থাকতে পারবেন, ইনশাআল্লাহ। এই সবকিছুই হবে সাহরী দিয়ে সিয়াম শুরু করার মাধ্যমে। আর মনে রাখবেন, আপনার ঘুমটাও কিন্তু 'ইবাদাত।

এছাড়াও পুরো দিন জুড়ে নিজের কাজ এবং কথার ব্যাপাবে সতর্ক থাকা উচিত। নিজেকে বারবার মনে করিয়ে দেবেন যে, আপনি এখন সিয়ামরত অবস্থায় আছেন। এটাকে পাশ কাটিয়ে যাবার মত বা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার মত কিছুতে পরিণত করবেন

না। মনে রাখবেন, শুধু খাবার আর পানি থেকে বিরত থাকার চেয়েও বেশি কিছু হচ্ছে আমাদের সাওম।

এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ বলেছেন, "যারা মিথ্যা কথা এবং মন্দ কাজ পরিত্যাগ করবে না, তাদের খাবার-পানি থেকে বিরত থাকার কোন জরুরত আল্লাহর নেই।"[বুখারি হাদিস ক্রম: ১৯০৩]

যখনই নিজের কামনা বাসনার প্রতি তাড়না অনুভব করবেন এবং সাওমের উদ্দেশ্যের উপর আপনার মনোযোগ হারিয়ে যেতে থাকবে, তখন নিজের মৌখিক শক্তিবৃদ্ধিকে ব্যবহার করুন। যাতে করে নিজেকে এবং অন্যদেরকে মনে করিয়ে দিতে পারেন যে, আপনি সিয়াম রাখছেন মন্দ কথা ও কাজ থেকে।
রাসূলে কারীম বলেছেন:
যদি সিয়াম পালনরত অবস্থায় কোন মূর্খ ব্যক্তি এসে তোমার সাথে ঝগড়া বাঁধায়, তবে তাকে বলে দাওঃ আমি সায়েম (সিয়াম পালনকারী)।” [বুখারি হাদিস ক্রম: ১৮৯৪]

উপদেশ হিসেবে এটাই আপনার জন্য এবং বাকি সবার জন্যও যথেষ্ট। প্রায়ই আমাদের মৌখিকভাবে, কখনো বা উচ্চস্বরে নিজেদেরকে নিজেদের লক্ষ্যগুলো মনে করিয়ে দেওয়া লাগে। নিজেকে ইতিবাচক কথা শুনিয়ে সঠিক পথে ফিরে আসতে চাপ প্রয়োগ করার ধারণাটা কারো কারো কাছে পাগলামি লাগতে পারে। কিন্তু এটা আমার প্রতিদিনের এমন একটা অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে এটা না করলে আমার একা একা লাগতে শুরু করে।

আরো মনে রাখবেন রাসূলুল্লাহ-এর অমূল্য উপদেশ। তাঁর এই উপদেশ সেই সময়ের জন্য যখন আমরা হতাশ হয়ে যাই।
তিনি বলেন, "যদি কেউ রাগত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে, তবে সে যেন বসে যায় যাতে তার রাগ চলে যায়। এতেও যদি রাগ না যায়, তবে সে যেন শুয়ে পড়ে।" [আবু দাউদ হাদিস ক্রম:৪৭৮২]

আমরা এই একই নিয়ম অনুসরণ করতে পারি যখন আমরা এমন কোন কিছু করার জন্য প্রলুব্ধ হয়ে পড়ি যা সিয়ামরত অবস্থায় করা উচিত নয়। আবার কখনো কখনো সময় অপচয়কারী কাজকারবার (টিভি, সোশ্যাল মিডিয়া, গ্যাজেটস, গেম খেলা ইত্যাদি) আর খারাপ অভ্যাস থেকে যদি আমরা বেঁচে থাকতে চাই তবে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। একটা খারাপ অভ্যাস বা খারাপ মেজাজ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা, অবস্থান বদল করা, অথবা এই পরিবেশ থেকে সবে গিয়ে অন্য কোন রুমে চলে যাওয়া হচ্ছে এমন কিছু কার্যকরী পরামর্শ যেগুলো আমাদের প্রোডাক্টিভিটি বাড়াতে সাহায্য করবে পুরো মাস জুড়ে এবং ধরে রাখবে আমাদের মনোযোগ জরুরি বিষয়ের উপরে।

২। **আয়াত মুখস্থ করা**

যখন আপনি ফরজ সালাতের জন্য দাঁড়াবেন, তখন যদি আপনি না জানেন যে আপনি সালাতে কি পড়ছেন, তাহলে সেটা আপনারা উপর খুব কমই প্রভাব ফেলবে। ধরুন, আপনি রাশিয়ান ভাষায় কারো সাথে ভালো আলাপ আলোচনায় মত্ত হয়ে আছেন। ধরে নিন রাশিয়ান আপনার ভাষা না। আপনি এই আলাপ আলোচনা চালাতে পারছেন কারণ আপনি আগেই মুখস্ত করে নিয়েছেন কী বলতে হবে। মুখস্ত করে কথা বলছেন বলে নিজে কী বলছেন সেটা আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন না। এই কথোপকথন অনর্থক। যদি আমরা সালাতে তিলাওয়াত করা আয়াতের অর্থ বুঝতে না পারি, তবে আমাদের সালাতের দশাও ঠিক এমনই।

অল্প দিয়ে শুরু করুন। সালাতের এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় যেতে যতগুলো বাক্যাংশ আমরা পড়ি, সেগুলোর অর্থ দিয়ে শুরু করা যাক। সূরা আল ফাতিহার অর্থ দিয়ে শুরু করতে পারেন, যদি ইতিমধ্যে এটা আপনার অজানা থেকে থাকে।

আর যদি আপনি অর্থ জানেন, তাহলে প্রত্যেকটি আয়াতকে অনুভব করুন। আমরা সেই মুহূর্তে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাথে কথাবার্তা বলছি আর আল্লাহ আমার কথার জবাব দিচ্ছেন। চিন্তা করুন তো। মাত্র একবার চিন্তা করে দেখুন, আল্লাহ আপনার কথার জবাব দিচ্ছেন?!

তারাবিহর ক্ষেত্রে সালাতে তিলাওয়াত করা হবে এমন প্রতিটি সূরার শব্দের অর্থ রামাদান আসার আগেই শেখা হয়ত সম্ভব হবে না। এর পরিবর্তে, আপনার মসজিদ থেকে জেনে নিন প্রতি রাত কুরআনের কতটুকু তিলাওয়াত করা হবে, তারপর সময়ের আগেই প্রস্তুত হয়ে নিন। রাতে যতটুকু তিলাওয়াত করা হবে, ততটুকুর অর্থসহ পড়ে ফেলুন আগেই আর পারলে প্রাসঙ্গিক প্রেক্ষাপটও পড়ে নিতে পারেন।

এভাবে যখন আপনি সালাতে দাঁড়াচ্ছেন এবং আপনার নিয়ত থাকছে যে আপনি সালাতে পরিপূর্ণভাবে সচেতন থাকবেন, তখন আপনার মাথায় এটা ঘুরবে না যে এইমাত্র রাতের খাবারে আপনি কি খেলেন অথবা 'ইশার সালাতের আগে কোন বিষয়টা নিয়ে মজা করতে পারেন নি এবং ঘরে গিয়ে সেটা শেষ করে আসার জন্য অপেক্ষা করতে পারছেন না।

আপনাকে সালাতে দাঁড়িয়ে কান খুলে মনোযোগের সাথে ইমামের তিলাওয়াত শুনতে হবে, আয়াতের অর্থ নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে হবে, ভাবতে হবে যে প্রেক্ষাপটে আয়াতটা নাযিল হয়েছিল, কল্পনা করতে হবে আয়াতটা এখন নাযিল হয় "আল্লাহ সচেতনতা" হিসেবে। হুমম...... ইন্টারেস্টিং। অতএব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সাওম বাধ্যতামূলক করেলেন যাতে একরে আমরা তাঁর ব্যাপারে আরো সচেতন হতে পারি। অথচ কয়েকদিন আগে আমি যা করছিলান। সেটা ছিল ঘড়ির ব্যাপারে সচেতন হওয়া।

আমরা অমনোযোগী হয়ে তাবাবিহ আদায় করি আর কিয়ামে দাঁড়িয়ে কুরআনের শব্দগুলো এমনভাবে শুনি যার কোনকিছুই আমাদের মাথার মধ্যে আলোড়ন। তুলে না। আমরা কুরআন বুঝি না, আর তাই কুরআনও আমাদের স্পর্শ করে। না। আমরা কিয়াম থেকে রুকুতে যাই, রুকু থেকে সিজদাহ, সিজদাহ থেকে জলসা, তারপর আবার সিজদাহ, তারপর কিয়াম এবং তারপর আবার রুকু এভাবে চলতে থাকে একটা চমৎকার, চাঙ্গা করে দেবার মত রুটিন। কটিনটা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, আমরা আমাদের মূল পেশীগুলোকে শক্তিশালী করে তুলতে চাই। কিন্তু আধ্যাত্মিকভাবে আমরা কী অর্জন করেছি? এমনকি বুদ্ধিবৃত্তিকভাবেও যদি আমরা একই কাজ করি তাহলে মুসহাফে লেখা শব্দগুলো যে আমাদের অপেক্ষায় আছে বছর বছর, সেগুলোর কী হবে?

এই রামাদানে তাই আসুন, আমরা লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করি। আসুন, আমরা ডুবে যাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সন্তুষ্টির জন্য কাজ করাতে, যাতে করে বারবার ঘড়ির দিকে না চাওয়া লাগে। আর কখন সমুচা আমাদের ঠোঁট স্পর্শ করবে, এটা নিয়েও ভাবা না লাগে। বরং এখন থেকে আমরা আমাদের ক্ষুধা অনুভব করবো সচেতনভাবে। সতর্ক থাকবো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ব্যাপারে, সতর্ক থাকবো আমার মুখে উচ্চারিত প্রতিটি শব্দের ব্যাপারে, সতর্ক থাকবো মনের মধ্যে খেলে বেড়ানো অথবা অন্তরে প্রবেশ করা যেকোন চিন্তা চেতনার ব্যাপারে। আসুন, এই মাসের প্রতিটি দিনে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এই ছোট্ট সময়ের ভিতরেই আখিরাতের অনেকগুলো ডেডলাইনে পৌঁছানোর জন্য চেষ্টা করতে থাকি।

ইনশাআল্লাহ, একটি সচেতন রামাদানের জন্য আমাদেরকে সহায়তা করতে কিছু পরামর্শ আমরা বিবেচনা করে দেখতে পারি। আশা করি, নিম্নলিখিত পরামর্শগুলো অনুসরণ করতে পারলে আমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারব এবং আমলে আরো বেশি মনোযোগী হতে পারব।

৩। **আল্লাহর সাথে কথা বলুন**

যেকোন কিছুর চেয়ে রামাদান আমাদের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার মাস হয়ে উঠাটা বেশি জরুরি। আল্লাহর সাথে এই সম্পর্ক না থাকার কারণেই আমরা ইবাদাতে নিজেদেরকে যুক্ত করতে পারি না, উদাসীনতার সাথে কোনমতে কাজ সেরে নেই। এটার কারণ হল, আমরা আসলে জানিই না আমরা কার ইবাদাত করছি, কার সাথে কথা বলছি। তো এই মাসে এই সমস্যাটা দূর করে ফেলুন। বসুন, শুধু আপনি আর আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা, আর কেউ নয়। আল্লাহর সাথে শুরু করুন গভীর, সত্যিকারের এক কথোপকথন। গভীরতা আনুন আপনার ভাষায়, আপনার শব্দে। মন খুলে কথা বলুন, নিজের সমস্ত লুকোনো কথা, লুকোনো অনুভূতি খুলে বলুন আল্লাহকে। কিংবা সারাদিন ধরে তাঁর সাথে কথা বলতেই থাকুন, বলতেই থাকুন। আপনি ড্রাইভিং করছেন, হুইল ঘোরাতে ঘোরাতেই আল্লাহর সাথে কথা বলুন। কাজে

ব্যস্ত আছেন, এই অবস্থাতেই আল্লাহর সাথে কথা বলুন। কাপড় পরছেন, নিজেকে আয়নায় দেখে নিচ্ছেন, তখনও আল্লাহর সাথে কথা চালিয়ে যান।

আর মনে রাখুন যে আল্লাহ রববুল ইযযাহ বলেছেন, তিনি আমাদের সাথে তেমনই যেমনটা আমরা তাঁকে নিয়ে চিন্তা করি। [বুখারি হাদিস ক্রম : ৭৫০৫]

আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লাকে বানিয়ে নিন আপনার বন্ধু, সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু। দেখবেন, সালাত আপনার কাছে তখন খুব একান্ত কিছু একটা হয়ে উঠবে, হয়ে উঠবে আপনার জন্য সবচেয়ে স্বস্তির জায়গায় প্রত্যাবর্তন যখনই আপনি আপনার হাত দুটো তুলে উচ্চারণ করবেন, "আল্লাহু আকবার!"

আল্লাহর কিন্তু ৯৯টা নামও আছে। যদিও বেশিরভাগ সময়েই, তাঁকে আমরা ডাকি শুধু এক নামে। আর অন্য কোন নাম জেনে থাকলেও সম্ভবত সেগুলোর অর্থ না জানা থাকায় আমরা বুঝতে পারি না কখন, কোন নামে তাঁকে ডাক উচিত। যদি আমরা আল্লাহর নামই না জানতে পারলাম, তাঁর গুণাবলী নাইয় শিখতে পারলাম, তাহলে বুকে হাত দিয়ে কি এচাবলাম যাবে যে সত্যি সত্যিই আল্লাহকে চিনতে পারলাম?

যদি আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার রহমত চাই, তবে আমাদের উচিত তাঁর নাম, আর রাহমান (পরম করুণাময়) ধরে ডাকা। যদি আমরা চাই আল্লাহ আমাদের আগের সব গুনাহ মাফ করে দিন, তবে আমরা ব্যবহার করবো তাঁর নাম আল 'আফুউ', অর্থাৎ যিনি ক্ষমা করেন। এভাবে আল্লাহকে ডাকার মাধ্যমে আমরা নিজেদের বারবার মনে করিয়ে দিতে পারবো যে আল্লাহ কে, কী তাঁর পরিচয়। তাঁর সাথে আমাদের এমন একটা সম্পর্ক গড়ে উঠতে শুরু করবে, যে সম্পর্ক আমাদেরকে নিয়ে যাবে আল্লাহর সাথে শুধু সৃষ্টিকর্তা আর সৃষ্টির সম্পর্কেরও অনেক অনেক বাইরে। আমাদের রব, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের জন্য শুধু সৃষ্টিকর্তার চেয়েও আরো অনেক, অনেক বেশি কিছু।

৪। **হোঁচট খাবেন আপনি**

আপনি পড়ে যেতে পারেন। হোঁচট খেতে পারেন। কিন্তু সবচেয়ে জরুরি যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে চেষ্টা কখনো বন্ধ করা যাবে না। যদি কোন একদিন আপনার পা পিছলে যায়, গুনাহ করে ফেলেন আর ভাবেন আপনার সিয়াম তো ব্যর্থ হয়ে গেল; যদি মনে হয় আপনি কী করছেন এবং কেন করছেন সেটা নিয়ে আপনার সমস্ত সচেতনতা অকার্যকর হয়ে গেল, তবুও কখনো বাকি মাসটুকু "এই ভাবেই কাটিয়ে দেব", এই ধোঁকায় পড়ে যাবেন না। ভুলকে টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে গ্রহণ করে নিয়ে নিজেকে রিমাইন্ডার দিয়ে রাখুন কিসের জন্য আপনি কাজ করে যাচ্ছেন।

রামাদান নিয়ে লেখা আর্টিকেল পড়ে অথবা কিভাবে কী করা উচিত বা উচিত নয়, এই সংক্রান্ত ভিডিও দেখে নিজেকে অনুপ্রেরণায় ভরিয়ে রাখুন, উদ্বুদ্ধ করুন। আলহামদুলিল্লাহ, অনলাইনে এইরকম আর্টিকেল, ভিডিও আছে প্রচুর। আর দেখেন না, আপনি তো একেবারে রাইট ট্র্যাকেই আছেন এখন! আপনি এই আর্টিকেলটা পড়ছেন। গুড, গুড, চালিয়ে যান মাশাআল্লাহ!

আরো একবার বলি, নিজের সাথে কথা বলুন। নিজেকে বলুন, হাল ছেড়ে দেওয়া চলবে না। নিজেকে বলে দিন, এই বছর, এই রামাদানটা আপনার জন্য অর্থবহ হতে যাচ্ছে। এই বছরটাতেই আল ওয়ালি'র (আল্লাহর গুণবাচক নাম যার অর্থ বন্ধু, সাহায্যকারী) সাহায্যে আপনি ঠিকঠাক সবকিছু করতে যাচ্ছেন। নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখাটা যেকোন কিছুতেই সাফল্য পাবার জন্য খুব জরুরি। রামাদানের ক্ষেত্রেও এটার ব্যতিক্রম হবে না। এমনকি রামাদানে কোন একটা দিন যদি আপনার খুব খারাপও কাটে, যদি এমন মনে হয় যে আপনি একেবারে শূন্য অবস্থায় পড়ে আছেন অথবা কারো সম্পর্কে বাজে কোন কথা বলেছেন যদিও আপনি জানেন যে সেটা উচিত হয়নি, তবুও শয়তানকে সুযোগ দেবেন না, তার দীর্ঘস্থায়ী নেতিবাচকতা যেন আপনাকে এটা বলতে না পারে যে তোমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না, তুমি উপযুক্ত না, তুমি যথেষ্ট ভালো না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাকে একেবারে পারফেক্ট হিসেবে পাওয়ার প্রত্যাশা করেন না। তিনি তো কেবল এই প্রত্যাশাই করেন যে আপনি যতবারই পড়ে যান না কেন, আবার এবং বারবার উঠে দাঁড়াচ্ছেন আপনি। আল্লাহ তো কেবল এটাই দেখতে চান, ভালোবাসেন। আল্লাহ পছন্দ করেন তাওবাকারিদের।

৫। **যতটুকু সম্ভব ততটুকুই করুন**

মাত্রাতিরিক্ত আগ্রহ উদ্দীপনা নিয়ে একসাথে সব করতে নেমে যাবেন না। লম্বা সময়ের জন্য কুরআন তিলাওয়াত অনেকসময় তার অর্থবহতা হারিয়ে ফেলতে পারে, হয়ত আপনি মুখের দ্বারা তিলাওয়াত চালিয়ে যাবেন, কিন্তু অন্তর তিলাওয়াতের সাথে যুক্ত থাকবে না। এমন অবস্থা হয়ে গেলে একটা বিরতি নিন। এমন কিছু করুন যার মাধ্যমে নিজেকে আল্লাহর সাথে জুড়ে দিতে পারেন। এমন কোন আমল করুন, যেটা করলে আমলে আল্লাহর সাথে জুড়ে যাবার অনুভূতি হয়।

নিজেকে চিনুন। আরেকবার পর্যালোচনা করে নিন আপনার দৈনিক রুটিন। যেমন কাজের রুটিন, পরিবার আর অন্যদের সাথে আগে থেকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ও অন্যান্য দায়িত্বের ব্যাপারগুলো। তারপর আপনার দৈনিক রুটিন থেকে যেসব জিনিস বাদ দেওয়া সম্ভব সেগুলোকে আলাদা করুন এবং সেই কাজগুলো বাদ দিয়ে আপনার সময়কে 'ফ্রি' করুন; যাতে আল্লাহর সাথে নিজেকে জুড়ে দেওয়ার মত আমল করার জন্য আপনি আরো বেশি সময় বের করে নিতে পারেন। বাস্তবসম্মত লক্ষ্য নির্ধারণ করুন। পরিস্থিতি আর আপনার সক্ষমতার সাপেক্ষে বাস্তবসম্মত লক্ষ্য নির্ধারণ আপনাকে নিজের কাজের ব্যাপারে মনোযোগী হতে আর সচেতন থাকতে সাহায্য করবে।

প্রতিদিন আর পুরো মাসের জন্য বাস্তবধর্মী লক্ষ্যের একটা চেকলিস্ট বানিয়ে ফেলুন। আর সাথে হিসেবে বাখুন প্রতিদিন কেমন উন্নতি হচ্ছে আপনার। কিন্তু সাবধান, বন্ধুদের সাথে সেটাকে তুলনা করতে যাবেন না আবার। আপনারা একই অবস্থানে, একই পরিস্থিতিতে নন।

৬। **পুরস্কারটা মান রাখুন**

যখন আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ব্যাপারে অসচেতন এবং অমনোযোগী হয়ে উঠি, তখন আমাদের ক্ষুধার কোন অর্থ থাকে না। যখন মনে হবে আমি আর পারবো না. আর এক মিনিটের জন্যও এগিয়ে যাওয়া সম্ভব না, তখন নিজেদের ফোকাস

ধরে রাখতে আর আরো বেশি কিছু করার জন্য নিজেকে চাপ দিতে আমাদের উচিত নিজেদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পুরস্কারের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। এটা ছাড়া সবকিছুই উদ্দেশ্যহীন আর শূন্য।

জান্নাতের ব্যাপারে ভাবতে থাকুন। জান্নাত দেখতে কেমন হবে? কাকে আপনি জান্নাতে আপনার পড়শি হিসেবে চান? কোন ধরণের ফল আপনার গাছে ঝুলে থাকতে দেখতে চান আপনি? আপনার জন্য কি সেখানে চকলেটের কোন নদী থাকবে নাকি জেলির ঘর? আপনি যেমন চাইবেন আপনার জান্নাত সেরকমই হতে পারে। যদি আমরা মনে মনে আমাদের জান্নাতকে সাজাই, একে করি তুলি বাস্তব, আমাদের জন্য তখন তার জন্য কাজ করা অনেক, অনেক সোজা হয়ে যাবে।

জান্নাতকে নিয়ে পড়ুন, জানুন কত ধরণের পুরস্কার দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের রব আমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন, মনের মধ্যে এর ছবি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করুন। আপনার লক্ষ্যকে বানিয়ে নিন বাস্তব।

এছাড়াও পুরো বছর জুড়ে কতশত রহমত যে আপনি না চাইতেই পেয়ে যাচ্ছেন সেগুলোকে নিয়ে ভাবার জন্য দিনের কিছুটা সময় বের করে নিন। এসব রহমত আমরা না চাইতে পেয়ে গেছি বলে এগুলোকে আমরা আমাদের অধিকার বলে মনে করি। আল্লাহ এখানেও আমাদের রহম করেছেন। আর এই নীরব ধ্যানের সময় যখন হঠাৎ আপনার পেট থেকে অদ্ভুত সব আওয়াজ গুড়গুড়িয়ে আসতে থাকে, তখন স্মরণ করুন তাদের কথা- রাতের বেলা খাবার মত যাদের কাছে কিছুই নেই অথবা সাহরিতে উঠে সামান্য কিছু মুখে দেবার মত কোন খাবার যাদের কাছে নেই।

যখন দেখবেন ক্লান্তি আর ক্ষুধা আপনার ইবাদাতের উপর প্রভাব বিস্তার করছে, তখন মনে রাখবেন সাওমের অতুলনীয় পুরস্কারের ব্যাপারে বলা অদ্ভুত আনন্দে ভরা।

হাদিসঃ

রাসূলুল্লাহ বলেছেনঃ "নিশ্চয়ই তোমাদের রব বলেছেন। প্রতিটি নেক আমল দশ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু সাওম আমার জন্য আর আমি নিজেই এব পুরস্কার দেব।" [মুসনাদু আহমাদ, হাদিস:৭৪৯৪]

"যে কেউ ঈমান নিয়ে এবং পুরস্কারের আশায় রামাদানের সাওম রাখবে, তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।”[বুখারি হাদিস-ক্রম: ৩৮]

কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়াটা স্বাভাবিক। যদি কোন অসাধারণ বিষয়ে আপনার লম্বা সময় ধরে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়ে যায়, তাহলে সেটা আর অসাধারণ থাকে না। এটা তখন সাধারণ হয়ে যায়। রামাদান অসাধারণ। কেন? কারণ এই মাসে আমাদের জন্য জমিয়ে রাখা অসাধারণ সব সুযোগ সুবিধা, সারা বছর যত নেক আমল করি সেগুলোর জন্য এই মাসে এক্সটা পয়েন্ট, এক্সট্রা সাওয়াব, আর আল্লাহর সাথে একটু বেশিই ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ এবং আমাদের জন্য সবচেয়ে সেরা, অনন্যসাধারণ একটা গিফট- কুরআন। কিন্তু এরকম ডজনখানেক রামাদানের পর আমাদের কাছে এটা সাধারণ হয়ে গিয়েছে, আমরা এটার সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছি। হ্যাঁ, কুরআন নাযিল হয়েছে - সেই রকম একটা ব্যাপার। শয়তানকে শেকল পরানো হয়েছে- হুম, বেশ তো জান্নাতকে রাখা হয়েছে উন্মুক্ত ওহ, তাই নাকি? অসাধারণ! এভাবেই আস্তে আস্তে সবকিছু নরমাল হয়ে গেছে, আমাদের কাছে রামাদানের যেন আর কোন বিশেষত্বই থাকে নি।

কিন্তু এইসব বিষয়ের ইঙ্গিত থাকা স্বত্ত্বেও, আমরা যদি ভালোমতো মনোযোগ দেই আর সচেতন হয়ে উঠি, তাহলে আমরা আবো একবার অনুভব করতে পারবো এই মাসের প্রত্যেকটা দিনের বিশালতা। এই বিশালতার অনুভব আমাদের হতে থাকবে প্রতিদিন, ইনশাআল্লাহ।

আমরা বুঝতে পারবো যে-

☆ আল্লাহর সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাধারণ বলে কিছু নেই।

☆ সবচেয়ে বিশাল ব্যাপার হল, আল্লাহ আমাদের সবাইকে বেছে নিয়েছেন। হ্যাঁ, আপনি আপনাকে বেছে নেওয়া হয়েছে আরো একটা রামাদানের সাক্ষী হবার জন্য।

☆ আমরা আমাদের নিজেদের কাছে বাধ্য, এই পবিত্র মাসটিকে সচেতনভাবে, উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে গ্রহণ করতে। কারণ আমাদের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার যে ভালোবাসা রয়েছে, সেটা স্রেফ "অসাধারণ!"

রোজার শারিরিক উপকারিতা

রোজা শুধু আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যই নয়, শারীরিক উপকারিতার দিক থেকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে যে রোজা রাখার মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন স্বাস্থ্য উপকারিতা অর্জন করা সম্ভব। এখানে রোজার শারীরিক উপকারিতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. হজমশক্তি ও পরিপাকতন্ত্রের বিশ্রাম

রোজা রাখার সময় শরীরের হজম প্রক্রিয়া একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিরতি পায়। ফলে পাকস্থলী এবং অন্যান্য হজম অঙ্গগুলো বিশ্রাম নিতে পারে। এটি পরিপাকতন্ত্রকে পরিষ্কার রাখে এবং হজমশক্তি উন্নত করে। যেহেতু দীর্ঘ সময় কোনো খাবার খাওয়া হয় না, তাই শরীর নিজেই চর্বি এবং অন্যান্য সঞ্চিত শক্তি ব্যবহার করে, যা হজমে সহায়ক।

২. ওজন নিয়ন্ত্রণ ও চর্বি হ্রাস

রোজা রাখার মাধ্যমে শরীরের অতিরিক্ত চর্বি কমানো যায়। রোজা রাখার সময় শরীর খাবারের অভাব পূরণের জন্য জমাকৃত চর্বি ব্যবহার করে শক্তি উৎপাদন করে। এটি ওজন কমানোর জন্য খুবই উপকারী। নিয়মিত রোজা রাখলে চর্বির স্তর হ্রাস পায় এবং শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে।

৩. রক্তচাপ ও রক্তের গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণ

রোজা উচ্চ রক্তচাপ ও গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়ক। খাবার এবং পানীয় গ্রহণ না করার কারণে শরীরের ইনসুলিনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে, যা রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমাতে সহায়তা করে। রোজা রেখে নিয়মিত খাওয়া এবং পান করার অভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে রক্তচাপ ও গ্লুকোজের নিয়ন্ত্রণ ভালোভাবে বজায় থাকে।

৪. ডিটক্সিফিকেশন বা শরীর থেকে টক্সিন অপসারণ

রোজা রাখার মাধ্যমে শরীরের টক্সিন বা বিষাক্ত পদার্থ বের হয়ে যায়। শরীর দীর্ঘ সময় খাবার ও পানীয় থেকে বিরত থাকে, ফলে এটি জমাকৃত বর্জ্য ও টক্সিন মুক্ত করতে থাকে। এটি লিভার, কিডনি ও ত্বকের কার্যক্রমকে সুস্থ রাখতে সহায়ক।

৫. ব্রেন হেলথ বা মস্তিষ্কের উন্নতি

রোজা রাখার ফলে মস্তিষ্কের নিউরোট্রফিক ফ্যাক্টর বৃদ্ধি পায়, যা মস্তিষ্কের নিউরন বা স্নায়ুকোষের উন্নতি ঘটায়। গবেষণায় দেখা গেছে, রোজা রাখার ফলে মস্তিষ্কের সেল গঠন, চিন্তা-শক্তি ও স্মরণশক্তি উন্নত হয়। এছাড়াও, রোজা মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায় এবং মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে।

৬. প্রদাহ কমায়

শরীরে প্রদাহ একটি সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যা, যা দীর্ঘস্থায়ী অনেক রোগের কারণ হতে পারে। রোজার সময় শরীরের কোষগুলো অতিরিক্ত কাজ থেকে বিরত থাকে, যা প্রদাহের মাত্রা কমাতে সহায়তা করে। ফলে আর্থ্রাইটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ এবং অন্যান্য প্রদাহজনিত সমস্যার ঝুঁকি হ্রাস পায়।

৭. হজমের সমস্যা কমায় রোজাপরিপাকতন্ত্রকে স্বাভাবিক কার্যক্রমে ফিরে যেতে সহায়তা করে এবং গ্যাস্ট্রিক, অ্যাসিডিটি, বদহজম ইত্যাদি সমস্যা হ্রাস করে। এতে পাকস্থলীর ভারসাম্য বজায় থাকে এবং হজমের সমস্যা কমে যায়।

৮. ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি

রোজার সময় শরীরে ডিটক্সিফিকেশন প্রক্রিয়া শুরু হয়, যা ত্বকের টক্সিন বের করে দেয়। এর ফলে ত্বকের স্বাস্থ্য উন্নত হয় এবং ত্বকে উজ্জ্বলতা আসে। নিয়মিত রোজা রাখলে ত্বকের ব্রণ, দাগ, এবং অন্যান্য সমস্যা হ্রাস পায়।

রোজা শুধু একটি ধর্মীয় বিধান নয়; এটি মানুষের শারীরিক সুস্থতায়ও অপরিহার্য ভূমিকা রাখে। নিয়মিত রোজা পালনের মাধ্যমে শরীরের ওজন, রক্তচাপ, গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা, হজমশক্তি উন্নত করা, এবং শরীরকে টক্সিনমুক্ত রাখা সম্ভব হয়। সুতরাং, রোজা পালন মানুষের জীবনে শারীরিক সুস্থতার জন্য একটি বড় আশীর্বাদ।

রোজার মানসিক উপকারিতা

রোজার মানসিক উপকারিতা ইসলামের আলোকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি শুধুমাত্র শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উপকারিতার জন্যই নয়, বরং মানুষের মানসিক শান্তি, স্থিতিশীলতা, ধৈর্য ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। কুরআন ও হাদিসের আলোকে রোজার মানসিক উপকারিতা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো।

১. ধৈর্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি

রোজা মানুষকে ধৈর্য ও সংযমের শিক্ষা দেয়। রোজা রাখার সময়, একজন মুসলিমকে খাবার, পানীয়, এবং অন্যান্য শারীরিক চাহিদা থেকে বিরত থাকতে হয়। এটি একজন মুসলিমের মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের গুণাবলি বৃদ্ধি করে, যা মানসিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা আনে। কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে:

"অবশ্যই, আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।" (সুরা আল-আনফাল, আয়াত: ৪৬)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"রোজা একটি পরিপূর্ণ ধৈর্যের অনুশীলন।" (সহীহ মুসলিম)

ধৈর্য শুধু শারীরিক চাহিদা থেকে বিরত থাকার ব্যাপার নয়, এটি মানসিক চাপ এবং মানসিক অস্থিরতা মোকাবেলার একটি শক্তিশালী হাতিয়ার।

২. মানসিক শান্তি ও প্রশান্তি

রোজা মানসিক চাপ কমায় এবং এক ধরনের প্রশান্তি এনে দেয়। এটি মানুষের চিন্তা ও মনকে একাগ্র করে, কারণ রোজা রাখার সময় একজন মুসলিম তার আধ্যাত্মিক জীবনে মনোনিবেশ করতে পারে। কুরআনে বলা হয়েছে:

"অতঃপর, স্মরণ রাখ, তোমাদের অন্তরে শান্তি আনা, আল্লাহর সাহায্য আসবে।"
(সুরা আল-ফাতহ, আয়াত: ৪)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে রোজা রাখে, তার মন শান্ত থাকে এবং সে কোনো খারাপ আচরণ করে না।" (সহীহ বুখারী)

এটি মানসিক অস্থিরতা বা উদ্বেগকে কমায় এবং মানসিক শান্তি অর্জনে সহায়ক হয়।

৩. আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি

রোজা রাখার মাধ্যমে একজন মুসলিম তার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করতে পারে। রোজার মধ্যে, একজন মুসলিম নিজের ইচ্ছাশক্তি ও আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কঠিন পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে শেখে। এটি মানসিকভাবে তাকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। রাসূল (সা.) বলেছেন:

"যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে রোজা রাখে এবং পুরস্কারের আশা নিয়ে রোজা রাখে, তার পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ করা হয়।" (সহীহ বুখারী)

এটি আত্মবিশ্বাসের অনুভূতি তৈরি করে, কারণ রোজা রাখার মাধ্যমে ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে এবং আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কারের আশা করে।

৪. আত্মিক উন্নতি ও আত্মবিশ্লেষণ

রোজা একজন মুসলিমকে আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মিক উন্নতির দিকে পরিচালিত করে। এটি একজনকে নিজের আচরণ ও চিন্তা-ভাবনা পর্যবেক্ষণ করতে শেখায়, যা মানসিকভাবে তাকে উন্নত করে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

"তোমরা কি মনে করো, তোমরা এভাবে বলবে এবং কাজ করবে আর তোমরা পরীক্ষা করা হবে না?" (সুরা আল-আনকাবুত, আয়াত: ২)

রোজার সময়, একজন মুসলিম নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এবং তার খারাপ অভ্যাসগুলো থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সচেতন থাকে। এটি আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মসমালোচনার একটি প্রক্রিয়া, যা মানসিক পরিপক্কতা তৈরি করে।

৫. মানসিক অস্থিরতা ও উদ্বেগ কমানো

রোজা মানসিক অস্থিরতা এবং উদ্বেগ কমাতে সহায়ক। শরীরের প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা থেকে বিরত থাকার ফলে মস্তিষ্কের অতিরিক্ত চাপ কমে যায়, এবং এটি মনোযোগ বৃদ্ধির পাশাপাশি মানসিক স্থিতিশীলতা আনয়ন করে। রোজার সময়, একজন মুসলিম তার মনকে শান্ত রাখতে এবং অবাঞ্ছিত চিন্তা বা উদ্বেগ থেকে দূরে থাকতে সচেষ্ট থাকে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে রোজা রাখে, তার সমস্ত শরীর পরিশুদ্ধ হয়, তার আত্মাও পরিশুদ্ধ হয়।" (সহীহ বুখারী)

৬. দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা বৃদ্ধি

রোজা একজন মুসলিমকে কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা শেখায়। এটি মানসিকভাবে তাকে আরও দৃঢ় এবং ধৈর্যশীল করে তোলে। রোজা রাখার সময়, ব্যক্তির মধ্যে সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পায় এবং সে দুঃখ-কষ্ট মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়।

৭. সামাজিক সম্পর্কের উন্নতি

রোজা মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও দয়া সৃষ্টি করে, যা তার সামাজিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করে। রোজার সময়, একটি মুসলিম অন্যদের খেয়াল রাখে এবং তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করে, যা মানসিক তৃপ্তি ও আনন্দ এনে দেয়।

রোজা শুধুমাত্র শারীরিক বা আধ্যাত্মিক উপকারিতার জন্য নয়, এটি মানসিকভাবে একজন মুসলিমকে দৃঢ়, শান্ত, এবং আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। কুরআন ও হাদিসের আলোকে দেখা যায় যে, রোজা মানসিক অস্থিরতা দূর করতে, ধৈর্যশীল হতে, সামাজিক সম্পর্ক উন্নত করতে এবং সর্বোপরি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এটি মুসলমানদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও শান্তির পথপ্রদর্শক হয়ে ওঠে।

রামাদানের শেষ দশ দিন

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার হুকুমে জান্নাত আমাদের জন্য নিজেকে। সৌন্দর্যমণ্ডিত করে চলেছে প্রতিনিয়ত। আর-রাহমান আল্লাহ রাব্বুল ইযযাত প্রতি মুহূর্তে আমাদের উপর তাঁর রহমত আর করুণাধারা বর্ষণ করছেন। আল্লাহর এই রহমত পাওয়ার ব্যাপারে আমাদের মধ্যে যেন কোনো নেতিবাচক চিন্তা কাজ না করে, বরং যাবতীয় অলসতা ঝেড়ে ফেলে আমাদেরকে আল্লাহর রহমতের আশায় নিজেদের সর্বোচ্চটুকু দিয়ে চেষ্টা করতে হবে। আমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমত এই যে, তিনি রামাদানের শেষ দশদিন আমাদের জন্য সব থেকে উত্তম দিন বানিয়েছেন। এই শেষ দশদিন হলো এমন কিছু সময়, যখন নিজেদের আত্মার সমৃদ্ধি এবং পরিচর্যার জন্য

বেশি জোর দিতে হবে। নিজেদের শরীরের আরামটুকু থেকে কিছু অংশ আত্মিক উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করাটা আমাদের জন্য খুব জরুরি।

সহিহ বুখারি এবং সহিহ মুসলিমে বর্ণিত আছে আইশা (রা.) বলেছেন, রামাদানের শেষ দশদিনে রাসূল (সা.) তাঁর সকল স্ত্রীদের রাতের বেলায় ডেকে তুলতেন। নবিজি (সা.) কিন্তু স্ত্রীদের রান্না বান্না অথবা নিজের কোনো ধরনের চাহিদা মেটানোর জন্য ডেকে তুলতেন না। রামাদানের শেষ দশদিন তিনি নিজেও সারা রাত ইবাদাত করতেন এবং তাঁর স্ত্রীরাও সারা রাত ইবাদাতে কাটাতেন।
সহিহ মুসলিমের এক বর্ণনাতে আছে,
"নবিজি রামাদানের শেষ দশদিন বছরের অন্য যেকোনো সময় থেকে বেশি ইবাদাত করতেন।" সহিহ বুখারিতে আছে আইশা (রা.) বলেছেন,
"রামাদানের শেষ দশদিন শুরু হবার সাথে সাথে নবিজি (সা.) কোমর বেঁধে
ইবাদাতে নেমে পড়তেন এবং উনার নিজে পরিবারবর্গকেও সারারাত জেগে ইবাদাত করতে বলতেন।" কোমর বেঁধে ইবাদাতে নেমে পড়া বলতে আসলে অত্যন্ত আগ্রহ, উদ্দীপনা আর উৎসাহ নিয়ে ইবাদাতে আত্মনিয়োগ করা বোঝানো হচ্ছে।

অনেক আলিম বলেছেন, কোমর বেঁধে নেমে পড়া কথাটি রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এর মানে হলো, রামাদানের শেষ দশ দিন স্ত্রীদের সাথে নবিজি (সা.)-এর কোনো সম্পর্ক থাকত না। আসলে শেষ দশদিন তিনি ইবাদাতে এতটাই মশগুল এবং ব্যস্ত থাকতেন যে-উনার স্ত্রীদের কাছে যাবার সময়টুকু পর্যন্ত পেতেন না। এটা সুফিয়ান আস-সাওরি (রা.)-এর মত এবং উনার এই মতটাই অধিক উত্তম। কারণ অন্যান্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (সা.) রামাদানের শেষ দশ দিন তাঁর বিছানাপত্র গুছিয়ে নিতেন এবং ইবাদাতে এত বেশি মশগুল হয়ে যেতেন যে, তাঁর স্ত্রীদের সাথে কোনোরকম সম্পর্কই থাকত না। স্ত্রীর সাথে সময় কাটানো অবশ্যই হারাম কিছু নয়, কিন্তু নবিজি রামাদানের শেষ দশ দিন এত বেশি ইবাদাত করতেন যে, স্ত্রীদের সাথে পর্যন্ত তখন উনার সম্পর্ক থাকত না।

ইবনু রজব (রহ.) বলেন, "নবিজি (সা.) রামাদানের প্রথম বিশদিন স্ত্রীদের সাথে ইসলামে অনুমোদিত সবকিছুই করতেন, আর শেষ দশ রাতে উনি এতটাই ইবাদাতে

মগ্ন থাকতেন যে পরিবারের সাথেও তাঁর সম্পর্ক থাকত না।" চিন্তা করুন, এই যদি হয় আমাদের রাসূল (সা.)-এর ইবাদাতের দৃষ্টান্ত, যিনি আল্লাহ তাআলার আযাবের ভয়ে সবসময় ভীত থাকতেন, যার অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে, এবং যিনি ছিলেন আল্লাহর সব থেকে কাছের এবং পছন্দের মানুষ - তাহলে আমাদের কী করা উচিত যেখানে আমাদের গুনাহ মাফ হবে কি না আমরা তা-ই জানি না? আমরা যদি নবিজি (সা.)-কে আমাদের সাধ্যমতো অনুসরণ না করি, তবে সেটা তো আমাদের নিজেদের সাথেই প্রতারণা করা হবে। অন্তত রামাদানের শেষ দশ দিন আমাদের উচিত নবিজি (সা.)-কে নিজেদের সাধ্যমতো অনুসরণ করা। এটা নিজের প্রতিই অবিচার করা হবে, যদি কেউ রামাদানের শেষ দশদিনের এই বিশাল সুযোগ কাজে না লাগায়। যদি এই বরকতময় সময় কাজে লাগাতেই কেউ আলসেমি করে, তাহলে সেই অলস ব্যক্তি আসলে ঠিক কোন দিনগুলোর সুযোগ নেবার অপেক্ষায় বসে আছে? তবে কি সে এমন দিনের অপেক্ষায় আছে যখন তাকে কবরে শুয়ে শুয়ে আফসোস করতে হবে?

ইবনু রজব (রহ.) বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে যে, রাসূল (সা.) শেষ দশদিন এমনভাবে ইবাদাতে মশগুল থাকতেন, যা তিনি বছরের অন্য কোনো সময়ে থাকতেন না। শেষ দশদিন তিনি রাত জেগে সালাত আদায় করতেন, যিকিরে মশগুল থাকতেন এবং কুরআন তিলাওয়াত করতেন। কাজেই আপনিও যে ইবাদাত করে প্রশান্তি অনুভব করেন এবং যে ইবাদাত করলে আপনার মনে হয় যে, আপনি আল্লাহর কাছাকাছি আসতে পারছেন-সেই ইবাদাতেই মশগুল হয়ে যান। যদি মনে করেন যিকির করে প্রশান্তি পান, তবে যিকিরে মশগুল হন। যদি কুরআন তিলাওয়াতে প্রশান্তি পেয়ে থাকেন, তবে কুরআন তিলাওয়াতে নিজেকে ঢেলে দিন। যদি সালাত আদায় এবং কুরআন তিলাওয়াতে প্রশান্তি পান, তবে এই দুই ইবাদাতেই নিজেকে ব্যস্ত রাখুন।

অনেকেই জিজ্ঞেস করেন, কোন ইবাদাত বেশি উপযোগী? আসলে আল্লাহ খুব ভালো করেই জানেন মানুষের স্বভাব সম্পর্কে, তাই তিনি ইবাদাতের বিভিন্ন পদ্ধতি বলে দিয়েছেন। কারো কাছে যেটা করতে অনেক ভালো লাগে, সেটা আবার অন্য একজনের কাছে ততটা ভালো না-ও লাগতে পারে। যেমন- সালাতের ক্ষেত্রে রাকাত সংখ্যার

ভিন্নতা আছে, দু-রাকাত, তিন রাকাত এবং চার রাকাত এরকম। অনেক বালাতে কিরাআত জোরে জোরে পড়া হয় আবার কিছু সালাতে নীরবে পড়তে হয়।

কিছু ইবাদাত ফরয, যা আমাদের অবশ্যই করতে হবে- আবার কিছু ইবাদাত নিজের ইচ্ছেমতো করা যায়। তাহলে ইবাদাতের সব থেকে ভালো উপায় কোনটা? আসলে যে ইবাদাত করে আপনি নিজের অন্তরে প্রশান্তি অনুভব করেন এবং যে ইবাদাত নিজের অন্তরের প্রশান্তির পাশাপাশি আল্লাহ তাআলার খুব কাছাকাছি যাবার শক্তি এবং সুযোগ করে দেয়-আপনার জন্য সেই ইবাদাতই সবচেয়ে উপযোগী।

লাইলাতুল কদরের কিছু বিশেষ দুআ আছে, যা আমরা পড়তে পারি। লাইলাতুল কদরে সারাবাত জেগে ইবাদাতে মশগুল হয়ে থাকাটা নবিজি (সা.) এর সুন্নাহ, সুতরাং আমরা নিজেরা এবং নিজেদের পরিবারের সবাইকে নিয়ে এই সুন্নাহটুকু পালন করব ইনশাআল্লাহ। সুফিয়ান আস-সাওরি (রহ.) বলেছেন, "যখন রামাদানের শেষ দশ রাতের আবির্ভাব হয়, তখন যেন আমরা নিজেরা ঘুম থেকে উঠে আল্লাহর ইবাদাত করি এবং নিজেদের পরিবারের সদস্যদেরও জাগিয়ে তুলি যেন তারাও এই ইবাদাতে শামিল হতে পারে, কারণ এই কাজের জন্য আল্লাহব কাছ থেকে আমরা পুরস্কৃত হব।"

ইবনু বাত্তাল (রহ) বলেন, এটা হাদিস থেকে প্রমাণিত যে, রামাদানে ও রামাদানের বাইরেও ইতিকাফ করা সুন্নাহ। ইতিকাফ ভুলে যাওয়া সুন্নাহগুলোর মধ্যে অন্যতম এবং আপনি যত বেশি এরকম ভুলে যাওয়া সুন্নাহগুলো পালন করবেন, তত বেশি আপনি পুরস্কৃত হবেন, কারণ এর মাধ্যমে আপনি একটি সুন্নাহকে পুনর্জাগরিত করছেন। ইবনু মুনযির এবং শিহাব বলেন, 'এটা খুবই বিস্ময়কর যে, মুসলিমরা ইতিকাফ ত্যাগ করেছে অথচ নবিজি (সা.) মদিনায় আসার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কখনও ইতিকাফ ত্যাগ করেননি।"

আবু হুরায়রা (রা.) ও আইশা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, নবিজি (সা.) মৃত্যুর আগ পর্যন্ত প্রতি বছর ইতিকাফ করেছেন। তিনি রামাদানের প্রথম দশদিনে ইতিকাফ করেছিলেন, তারপর তিনি রামাদান মাসের দ্বিতীয় দশদিনে ইতিকাফ করেছিলেন এবং তারপর তিনি রামাদানের শেষ দশদিনেও ইতিকাফ করেছিলেন, আর শেষ দশদিনে

আমাদেরকে এটি করতে বলেছেন। এটাই রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহ, যা তিনি মৃত্যু পর্যন্ত করে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে এটি রামাদান মাসে নবিজি (সা.) -এর কাছে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যে, কোনো কারণে ইতিকাফ মিস হয়ে গেলে পরবর্তী মাস শাওয়ালের প্রথম দশদিনে এটি পালন করতেন। যে বছর তিনি মারা যান, সেই বছর সহ মোট বিশ বছর ইতিকাফ পালন করেছেন। ইবনু হাজার ব্যালন, "এক বছর সফরে থাকায় তিনি একটি ইতিকাফ মিস করেন, তাই পরবর্তী মাসে এটি পালন করেন। তিনি লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করার সময়ে ইতিকাফ করতেন।"

ইতিকাফ আপনাকে দুনিয়াবি সব কিছু থেকে এবং সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হে আল্লাহর সাথে সংযোগ স্থাপন করায়। আপনাকে আল্লাহর সাথে সংযোগ স্থাপন করেছে।

সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক আল্লাহর সাথে সংযোগ স্থাপনের চেয়ে আনন্দের আর কী হতে পারে! যে কেউ অন্যকে ভালোবাসে, সে ভালোবাসার মানুষের সাথে একা থাকতে পছন্দ করে-এটাই বাস্তবতা। যে আল্লাহকে ভালোবাসে, সে আল্লাহর সাথে একা সময় কাটাতে ভালোবাসবে। এতটুকু জানার পর আমরা নিজেদের প্রশ্ন করবে। পারি, আমরা কি আসলেই আল্লাহকে ভালোবাসি? ইতিকাফ অন্তরকে পুরোপুরি আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য একটি ট্রেনিং সেশন। ইতিকাফ দুনিয়ার সাথে সর ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করায়।

রামাদানের শেষ দশ রাতের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করুন।
আমাদের সালাফরা যৌবনে থাকতেই বলতেন যে, "আল্লাহর ইবাদাতের জন্য আমরা দ্রুতগামী যোয়ার মতো দৌড়াচ্ছি।" এমন নয় যে তাঁরা বৃদ্ধ বয়সের উপনীত হওয়ার পর আল্লাহর ইবাদাতে মনোনিবেশ করেছেন, বরং যুবক থাকতেই তাঁরা নিজেদের সবকিছু নিয়ে আল্লাহর ইবাদাতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সালাত, আল্লাহর যিকির ও প্রশংসা, কুরআন তিলাওয়াত, সাদাকা সহ কুরআন-হাদিস অনুযায়ী যত ধরনের ইবাদাতের কথা আপনার মাথায় আসবে, সেই সকল ইবাদাতে নিজের সব কিছু উজাড় করে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। রামাদানের শেষ দশ রাতের মধ্যেই আছে সেই বহু আকারিঙ্ক্ষত রাত-যা হাজার বাত অপেক্ষা উত্তম-যে রাতেই কুরআন নাযিল হয়েছিল।

নিজের বিশ্রাম এবং ঘুম সংক্ষিপ্ত করুন, অলসতা ঝেড়ে ফেলুন এবং আল্লাহর ইবাদাতের জন্য বিনয়ের সাথে উঠে দাঁড়ান। নিজের উৎসাহ আর উদ্দীপনাকে উজ্জীবিত করুন আর সব ধরনের ঢিলেমিকে বিদায় জানান, কারণ আপনি এখন ইবাদাতের ক্ষেত্রে সাহাবিদের সাথে প্রতিযোগিতায় নামবেন। আমরা চাই, জান্নাতে যখন সাহাবিদের সাথে আমাদের দেখা হবে, তখন যেন তাঁরা আমাদের দেখে বুঝতে পারেন যে, তাঁদের পরেও দুনিয়াতে এমন বান্দা ছিল যারা ইবাদাতে তাঁদের সমকক্ষ হয়েছিল।

রামাদানের শেষ দশ দিন যেন রামাদানের প্রথম বিশ দিনের মতো না হয়। আপনার রামাদান যেন বছরের অন্যান্য আর সাধারণ দিনের মতো চলে না যায়। শেষ দশ দিনে আপনাকে ইবাদাতের ক্ষেত্রে পূর্বের সকল মাইলফলক অতিক্রম করতে হবে, অর্থাৎ রামাদানের শেষ দশ দিনে, রামাদানের প্রথম বিশ দিনের সম্মিলিত ইবাদাতের থেকেও বেশি ইবাদাত করতে হবে।

আমরা কেউই জানি না আমরা পরের রামাদান পাব নাকি তার আগেই আমাদের অন্ধকার কবরে আশ্রয় নিতে হবে। আমরা তো এটাও জানি না কবরে আমাদের অবস্থা কেমন হবে! রামাদানের এই সময়গুলোর মতো আমাদের জীবনও এভাবেই শেষ হয়ে যাবে। মুমিন এবং পাপী উভয়েই চলে যাওয়া সময় নিয়ে আফসোস করবে। মুমিনরা এই ভেবে আফসোস করবে যে, কেন সে আরও বেশি ইবাদাত করল না, আর পাপী আফসোস করবে কেন সে আল্লাহর দিকে ফিরে এলো না। কাজেই আল্লাহর ইবাদাতে দ্রুততার সাথে এগিয়ে আসুন, তাহলে আল্লাহও আপনার দিকে দ্রুততার সাথেই এগিয়ে আসবেন ইন শা আল্লহ।

রমাদান আমাদের জন্য নিয়ে আসে পবিত্রতা, আত্মশুদ্ধি ও তাকওয়ার অনুশীলন। এই মাস শেষে আমরা যেন সেই অর্জনগুলো ধরে রাখতে পারি এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকি।

ইয়া রব্বি...আমাদের রোজা, নামাজ ও ইবাদতসমূহ কবুল করুন। আমাদের জীবনে রমাদানের আলো জ্বালিয়ে রাখুন এবং আমাদের গুনাহ মাফ করুন। আমিন।”

তথ্যসূত্র:

মাসিক আল- কাউসার, আল- হাদিস, ধুলিমলিন উপহার রামাদান, প্রোডাক্টিভ রামাদান।